নজরুলের গানের ভূবন ঃ সমকালে

প্রতিভার বিকাশ আপনাতেই হয়। পরিচর্যা পেলে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়, নচেৎ অল্পতেই নিঃশেষিত হয় সকলের অগোচরে। নজরুলের গানের ভুবনে আত্মপ্রকাশ হঠাৎ হয়েছিল পিতৃব্য বজলে করীমের দৃষ্টিতে পড়েই এবং তাঁরই প্রয়োজনে নজরুল সংগীতভূবনে চলে এলেন। নজরুলের বয়স যখন আট তখন তার পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু হয়। ফকির আহমদের প্রপিতামহ কাজী খেবরতুল্লাহর আবস্থা ভাল ছিল। সমাজে তিনি একজন সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কিন্তু ফকির আহমদের সময় তার কণামাত্র ছিল না। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরার কেউ ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই নজরুল মেধাবী ছিলেন। কিন্তু দারিদ্রের কারণে মক্তব থেকে নিবপ্রাইমারীতে উঠে তাঁকে দশ বৎসর বয়সে ছাত্র পড়ানো শুরু করতে হয়েছিল। এ সময় তাঁকে হাজী পাহলোয়ানের মাজারে খাদেম ও পীরপুকুর মসজিদে ইমামের কাজ। ছেলে বেলায় কোরআন শরীফ মোটামুটি পড়েছিলেন। গলার স্বর এবং সুর দুটোই ছিল মিষ্টি। চুরুলিয়ার মক্তবের শিক্ষক কাজী ফজলে আহমদের কাছে নজরুল আরবী-ফার্সি এবং উর্দু শিখেছিলেন। এ সময় হঠাৎ তাঁর সংগীত উন্মেষ ঘটে। পিতৃব্য বজলে করীম বাংলায় গীত রচনা ছাড়াও উর্দুতে গজল রচনা করতেন। গানে সুর দেবার ক্ষমতাও ছিল বেশ। তাঁর প্রেরণাই নজরুল ছেলেবেলায় গান রচনা ও তার সুর দিতে শেখেন। এ সময় চুরুলিয়াতে 'লেটো' গানের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। পিতৃব্য কাজী বজলে করীম একটি 'লেটো' দলের প্রধান ছিলেন। নজরুলের গানের প্রতিভা দেখে তিনি তাঁকে 'লেটো' দলে নিয়ে এলেন। 'লেটো' দলে গীত রচনা এবং পরিবেশনকারীর লড়াই হ'তো। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই লড়াই হ'তো। এই গানের একজন দলপতি থাকতো এবং অন্যান্যরা 'পাঁচ-দুয়ারী' ধরতো। যাত্রাগানের মতো পালা থাকতো এই গানে। অভিনয় এবং নাচ লেটো গানের বৈশিষ্ট ছিল। 'কবি-গানে'র একটি সংস্করণ ছিল লেটো গান। গ্রামের মানুষ গানের লড়ায়ে মজা পেত। নজরুল সে সময়ে গানের বাণীতে মজাদার শব্দ সংযোজন করে লেটো গানের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পিতৃব্য কাজী বজলে করীমের আসর পরিচালনা, পালা রচনা, গান বাঁধা সব শিখে নিলেন নজরুল। নজরুলের সংগীতপ্রতিভা সে সময়ের বিখ্যাত লেটো গানের রচয়িতা ও দলপতি শেখ চকোর গোদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লেটো দলের জন্য তাঁর গান রচনা ও গান বাঁধা দেখে অনেকেই তাঁর কাছে আসতেন। আশে-পাশের গ্রামে নজরুলের নাম

ছড়িয়ে পড়ল। যে কেউ এলে তাকেই নজরুল গান লিখে দিতেন খুব অল্প সময়ে। সুরও তাঁকেই শিখিয়ে দিতে হ'তো। নজরুল নিজেও এ-গানে বেশ মজা পেতেন। এসময়ে গ্রামে গ্রামে 'সঙ' সাজার প্রচলন ছিল। তারা বাড়ীবাড়ী গান গেয়ে ফিরতো। নারী-পুরুষ মিলে তাদের গান শুনতো। এমনিভাবে চাপান গান, কবিগান ইত্যাদি লিখতে থাকেন নজরুল। আরবি-ফার্সি, উর্দু এবং ইংরেজীর মিশেল দিয়ে গান রচনা করে নজরুল সে সময় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইতোমধ্যে পিতৃব্য কাজী বজলে করীমের মৃত্যু হলে নজরুলকে লেটো দলের দলপতি হতে হয়। এবার প্রত্যক্ষ সমরে সেই কৈশোরকালেই তিনি বড় বড় লেটোদলের দলপতিকে হারিয়ে দিতেন তিনি। ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

লেটো পালার প্রথমে থাকে বন্দনা গান। নজরুল বিরচিত একটি লেটো পালায় বন্দনা গানের নমুনা নিবে দেওয়া হল ঃ

সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারী তালা
তারপর দরুদপড়ি মোহাম্মদ সল্লে আলা
সকল পীর আর দেবতাকুলে
সকল গুরুর চরণমুলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে হয় যেন গো মুখ উজালা
সর্বপ্রথম বন্দনা গাই তোমারই ওগো খোদাতালা

'চাষার সঙ' পালায় চাষাবাদের বিষয়গুলোকে দেতত্ত্বের আলোকে সাধন-ভজনের রূপ দিয়েছিলেন কিশোর নজরুল।

চাষ করো দেহ জমিতে
হবে যে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি উগোলে
রোজাতে জমি সামালে
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কিহে এই ভবেতে ॥
লা ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পারি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে । ।
নয়টা নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়ত যাহার
ফসল জন্মিবে তাহাতে ॥

যদি ভাল হয় সে জমি
হজ জাকাত লাগাও তুমি
আরো সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে ॥

নজরুল ইসলাম এমন অনেক দেতত্ত্বমূলক গান সে সময় রচনা করেছিলেন যা সাধু ফকিরদের অধ্যাত্মসাধনার গান। এমনি অল্প বয়সে সে সময় ইংরেজি - বাংলা - হিন্দি - উর্দু মিশিয়েও রঙ্গ ব্যঙ্গরসে ভরা গান রচনা করেছেন নজরুল। লেটোর দলের দলপতি হয়ে অন্য দলকে তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করে নিজের দলকে সেরা দলে পরিণত করার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন নজরুল। এমনি দুটি গান ঃ

এক।

ওহে ছড়াদার, ওহে That পাল্লাদার
মস্তবড় Mad
চেহারাটাও Monkey like
দেখতে very Cad
Monkey লড়বে বাবর কি সাথ
ইয়ে বড় তাজ্জুব কী বাত
জানেনা ও ছোট হলেও
হম ভি Lion Lad
শোন ও ভাই brother দোহারগণ
মচ্ছর ছানারা সব করিয়াছে পণ
গান গাহিবে আসর মাঝে
খবর বড় sad.

দুই ।

রব না কৈলাশপুরে I am Calutta going
যতসব English fashion হাহা মরি কি Lightning
English fashion সবইতার
মরি কি সুন্দর বাহর
দেখলে বন্ধ দেয় Chair
Come on dear good morning!
বন্ধু আসিলে পরে
হাসিয়া Hand shake করে
Holding out a meeting.
তার পর বন্ধু মিলে

Drinking হয় কৌতুহলে
খেয়েছে সব জাতিকুলে
নজরুল ইসলাম telling.

কী অসাধারণ ব্যঙ্গরসে ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতিকে ঘায়েল করলেন নজরুল। এত অল্প বয়সে এমন ভাবনা সত্যি আশ্চর্যের। লেটোর দলের জন্য ফার্সি গানও লিখেছিলেন নজরুল। যেমনঃ

নী - আ- চুনা বে - তু এ্যায় বেহেস্তী
রোয় মশগুলাম
জো ইয়াদ দীদার জামী
মিয়ায়েদ খেসতা নাম
যে - দি- দাস্ত না তোয়ানাম
দীদার কার দান
গাবে আজ মোবাবেলা
কে তার মিয়ায়েদ বীনাম
নজরুল ইসলাম বো গায়েদ
তু সবর মী ফরমায়েদ
চন্দরে চাশমে শাহেদ
ইয়াদ তু কুল হারদাম

উপরের গানটি বাংলা করে নজরুল একই সুরে রচনা করলেন ঃ

প্রেমেতে মত্ত হয় হেন মন নিজেকে হয় না স্মরণ
অপ্সরীর মত কদম
মরি কি রূপ অনুপম ॥
মিটে না সাধ তোমায় হেরে
জাগিয়ে হে প্রাণেশ্বরে
মরলেও তার বক্ষ পরে
নাইগো দুঃখ প্রিয়তম ॥
নজরুল ইসলাম কয় খেদে
প্রিয়ার রূপ আঁখি মুদে
সর্বদা কর স্মরণ ॥

নজরুলের সংগীত বিষয়ে একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছেন করুণাময় গোস্বামী। বইটি আদ্য-পান্ত পড়া হলে নজরুলের সংগীতপ্রতিভা সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা যাবে। করুণাময় গোস্বামী নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ করেছেন। সর্বক্ষেত্রে

মতের মিল না হ'লেও নজরুলের গান নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে চান, তাদের জন্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আমার এ নিবন্ধে উল্লিখিত গান সমূহ তাঁর গ্রন্থ থেকে নেয়া। এই প্রসঙ্গে ড. মিলন দত্ত বিরচিত নজরুল জীবনচরিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। সম্প্রতি অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী 'লেটো গান' এর উপর একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এ সব গ্রন্থ পাঠ করে সহজেই বোঝা যায় যে নজরুলের প্রতিভা কত অসাধারণ। প্রতিভা যে অর্থে নব নব উন্মেষ- -শালিনী বুদ্ধির পরিচায়ক, নজরুলের গান ও কবিতা এই প্রতিভার সফল প্রকাশ। লেটোর দলকে কেন্দ্র করেই নজরুলের সংগীত জগতে প্রবেশ অধিকার ঘটেছে। এখানে তিনি নিজের একটি ভুবন গড়ে তুলেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতিকে নিয়েই তিনি এ সব গান রচনা করেছেন। বস্তুত, নজরুল-প্রতিভা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত। নজরুল তাঁর গান কবিতা, সাহিত্য কোন কিছুই সংশোধন বা সংস্কার করেন নি কখনও। এ'টিই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির বুকে যেমন ফুল ফোটে, বৃক্ষরাজী ভরে ওঠে পত্র পুষ্পাচ্ছাদিত হয়ে। নদী যেমন চলতি পথে আবর্জনা নিয়েও এগিয়ে যায়, তাতে তার গৌরব ক্ষুন্ন হয় না, তেমনি নজরুলের গান সংস্কারবিহীন হলেও সৌন্দর্যহীন হয়নি। এখানেই নজরুলের অহঙ্কার। রবীন্দ্রনাথ গান কবিতা প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বারবার তা সংস্কার করেছেন। পৃথিবীর তাবৎ লেখকদের এ অভ্যাস রয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন নজরুল। সেই লেটোর দল থেকে শুরু করে পরবর্তী জীবনে যে গান তিনি রচনা করেছিলেন তা আজও অমলিন।

লেটোর দল থেকে বেরিয়ে নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে শিয়ারসোল রাজ স্কুলে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। মেধাবী ছাত্র হয়েও শেষ পর্যন্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন না নজরুল। সৈনিক জীবনে গিয়ে তাঁর প্রতিভার নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে সাহিত্য এবং গানের জগত। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বলেছিলেন 'বাংলা সাহিত্য তাঁকে দাবী করে' সেটাই তিনি প্রমাণ করলেন অমৃত্যু সাহিত্য এবং সংগীত নিয়ে কাজ করে।

নজরুলকে সংগীত নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল কারণ সাহিত্য বা কবিতা তাকে অর্থ দিতে পারেনি। গানের জগতে এসে তাঁর কষ্টটা কিছুটা কমে ছিল। এখান থেকেই তিনি নাট্যজগত এবং ফিল্মের জগতেও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। বড় বড় গীতিকার তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন গানের জন্য।

করুণাময় গোস্বামী তাঁর বিবরণ দিয়েছেন। নজরুল কত যে গান লিখেছেন তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। যা উদ্ধার করা গেছে তাতে তাঁর গান তিন হাজার পেরিয়ে যাবে। অনেক গানতো উদ্ধারই হয় নি। অনেককেই তিনি গান ও কবিতা লিখে দিয়েছেন। তা কেউ প্রকাশ না করায় সংরক্ষণও সম্ভব হয় নি।

নজরুলের গান তাঁর সমকালে উভয় বাংলায় সমাদৃত হয়েছিল। নজরুল তার সমকালে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তা তার সাহিত্যকর্ম এবং সাংবাদিকতার জন্যে

তো বটেই, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ছিল তাঁর গান। মুজফফর আহমদ বলেছেন, ঃ 'নজরুলের জনপ্রিয়তার জন্য একটি কারণ ছিল তাঁর গান। আমার মতে নজরুল খুব সুকণ্ঠ গায়ক ছিলনা। তবে সমস্ত দরদ দিয়ে সে গান গাইত। তাই, তার গান সব শ্রেণীর লোককে আকর্ষণ করত। সকলেই তার গান শুনতে চাইত। সময় হাতে থাকলে নজরুল কারো অনুরোধ ফেলত না। প্রথমে হিন্দু- মুসলিম ছাত্র- ও কেরানীদের মেসগুলো হতেই গান গাওয়ার জন্যে নজরুলের আমন্ত্রণ আসতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে এই আমন্ত্রণ প্রসারিত হতে লাগল অনেক সব হিন্দু পরিবারেও। আমি অনেক সময় নজরুলের সঙ্গে অনেক মেসে গিয়েছি। গানের মজলিসের খরচ ছিল মাত্র কয়েক পেয়ালা চা। নজরুলের সঙ্গে কোন হিন্দু পারিবারিক গানের মজলিশে আমি কখনও যাইনি। সেই সব পরিবারে নিশ্চয় নজরুলের অনেক যত্ন হতো। এই ভাবে তার শুধু জনপ্রিয়তা বাড়ছিল তা নয়, সে একটা সামাজিক বাঁধ ও ভেঙে দিচ্ছিল।

অন্য গান যে নজরুল দু'- একটি গাইত না তা নয়, কোনো হিন্দুস্থানী বস্তী সংলগ্ন জায়গায় গেলে সে হিন্দুস্থানী গান ও গাইত, এমন কি দু'-একটি হিন্দুস্তানী গান সে নিজেও করেছিল এসব সত্বেও সে মূলত গাইত রবীন্দ্রনাথের গান। এত বেশী রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে কি করে মুখস্থ করেছিল তা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। সমস্ত 'কুরআন' যারা মুখস্ত করেন তাদের হাফিজ বলা হয়। আমরা বলতাম নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র-সংগীতের হাফিজ।

নানান জায়গায় গান গাওয়ার ভিতর দিয়ে শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নজরুল ইসলামের সংযোগ ও পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্র- সংগীতের গায়ক হিসাবে তখন কলকাতায় শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের খুব নাম। এই পরিচয়ের পর হ'তে হরিদাস বাবু ও নজরুল রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার জন্যে একসত্বে অনেক জায়গায় যেতে লাগলেন। .....

নজরুল শুধু শিক্ষিত সমাজে কাব্যচর্চা করত না। তার পরিচয়ের পরিধিও সুবিস্তৃত হয়ে পড়ছিল। আমি দেখেছি তার গান ও কবিতার আবৃত্তি শোনার জন্যে চটকলের বাঙালী মজুরেরা পর্যন্ত ডেকেছে। পরে সে কৃষকদের ভিতরেও ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে। অর্থাৎ শুধু শিক্ষিত সমাজের গণ্ডির ভিতরে সে নিজেকে ধরে রাখেনি। সে পৌঁছেছে জনগণের মধ্যেও। এই জন্যেই বাংলা দেশের কবিদের ভিতরে নজরুল ইসলাম সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিল। আজও কারখানার মজুরেরা পর্যন্ত তার জন্ম দিবস পালন করেন।" (মুজফফর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯)

বস্তুত, মুজফ্ফার আহমদের এই স্মৃতি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে তিনি যত কাছ থেকে নজরুলকে দেখেছিলেন এমন অন্য কেউ দেখে নি। মুজফ্ফর আহমদ না কবি এবং না সঙ্গীতজ্ঞ, কিন্তু নজরুলের প্রতি ছিল তার অপারিসীম দরদ। নজরুল রাজনীতিতে সফল হবে না - তা তিনি বুঝেছিলেন। রাজনীতিতে স্বার্থপরতা আছে, নজরুলতো এ সবের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। অনেকে মনে করেছিল নজরুল কবি ও

গায়ক হিসেবে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, তার জন্য তিনি রাজনীতিতে সফল হবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। এক দিকে ভালোই হয়েছিল। হয়তো তখন বর্তমান নজরুলকে আমরা পেতাম না। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লেখেন ঃ "পল্টন হতে ফিরে আসার পরেও সে তার গানের চর্চা অবিরাম চালিয়ে গেছে। শুধু বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় না হয়ে সে যে জনসাধারণে ভিতরেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার গানই তার প্রধান কারণ। শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা একজন বয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের দু'একটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় বহু পত্রিকায় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার স্বরলিপি ছাপ হতো। একদিন শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তের নিকট হতে নজরুল একখানা পত্র পেল। তাতে তিনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে সে যেন গানের কায়দা-কানুনের কাঠামোর ভিতরে গান লেখে। অর্থাৎ, আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি ভাগ করে গান রচনা করার কথা তিনি তাকে বলেন। এই ভাবে গান রচনা করলে সেই গানের সুরাপোপে ও স্বরলিপি তৈয়ার করার সুবিধা হয়, এই কথাও তিনি পত্রে লিখেছিলেন। তখনও তাঁর সাঙ্গে নজরুলের মুখোমুখি পরিচয় হয় নি। সে যখন সত্যকার গান রচনা শুরু করেছিল তখন সম্ভবত শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার উপদেশ সে মেনে চলছিল। .....

.....৮/১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে নজরুল যখন বাস করতে এলো (১৯২৮ সালের শেষাশেষি হবে, মাসটা মনে করতে পারছিনে) তখন সে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রচিত গান তারই দেওয়া সুর-শিল্পীরা তখন সর্বত্র গাইছেন। বিশেষ করে, তাঁর নূতন রচিত গজল গানগুলির জনপ্রিয়তা তখন অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সঙ্গীতে নজরুল ইসলাম যতই প্রতিষ্ঠিত হো'কনা কেন, বৃটিশ কোম্পানীর নিকট সে ছিল সম্পূর্ণ বর্জিত। যে-ব্যক্তি রাজনীতিতে (রাজ-নীতি মানেই তখন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম) যোগ দিয়েছে তার জন্যে জেল খেটেছে, তার সঙ্গে কি করে একটা বৃটিশ কোম্পানী যোগ স্থাপন করতে পারে?

কিন্তু দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানীও ছিল একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর নিকটে চারদিকে হতে জিজ্ঞাসা আসতে লাগল যে তাঁদের রেকর্ডে কাজী নজরুল ইসলামের গান নেই কেন? এই রকম জিজ্ঞাসা আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সুর-শিল্পীরা যাঁর গান দেশের সব জায়গায় গেয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে উঠবে না এটা কেমন কথা? কোম্পানীর টনক নড়ল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে কাজী নজরুল ইসলামকে এড়িয়ে চলার মানেই হবে ব্যবসায়ের দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কোম্পানীর কর্মকর্তারা এই অবস্থায় যখন নজরুলের ঠিকানা জোগাড় করতে যচ্ছিলেন তখনই তাঁরা খবর পেলেন যে তাঁদের রেকর্ডের দুটি গান তার লেখা। সুবিখ্যাত গায়ক শ্রী হরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের দু'টি কবিতার অংশ বিশেষ সুর দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তখন তিনি কোম্পানীকে জানতে দেন নি যে এই দু'টি গানের রচয়িতা কে? জানতে

দিলে কোম্পানীর কর্তারা গান দু'টি তাঁকে গাইতে দিতেন না। এখন কিন্তু খবরটি জানতে পেরে কোম্পানীর কর্তারা খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার পাওনা রয়ালটির হিসাব করে দেখা গেল যে নজরুলের কয়েক শ টাকা (কত টাকা আমার মনে নেই) পাওনা হয়েছে। এই টাকাটা তাঁর লোক মারফতে সোজাসুজি নজরুলের নিকট তার ৮/১ পান বাগান লেনের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। কোম্পানীর দ্বারা সে আমন্ত্রিতও হলো যে তার গান যেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাইতে দেওয়া হয়। এই ভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সহিত স্থাপিত হয়েছিল নজরুলের প্রথম সম্পর্ক।" (মুজফ্ফর আহমদ, স্মৃতিকথা, প্রাগুক্ত ২০৮-২০৯) হরেন্দ্র দত্ত নজরুলের যে দু'টি গান গেয়েছিলেন তাঁর একটি ছিল জাতের নামে বজ্জাতি। অন্য গান ছিল পুঁথির বিধান যাক পুড়ে।' একটি গান ছিল রজনীকান্ত সেন রচিত, 'তাই সেই ভালো মোদরে মায়ের ঘরের শুধু ভাত।' নলিনীকান্ত সরকার, (আমার বাড়ীতে নজরুল, নজরুল কথা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত কলকাতা, সাহিত্যাম, ১৯৮০, পৃ. ৯৭)

এ সময় নজরুলের গান সারা বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। দিলীপ কুমার রায়, নলিনী কান্ত সরকার, সাহানা দেবী এমন প্রথিতযশা ব্যক্তিরা নজরুলের গান গেয়ে দেশ মাতিয়ে রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হরেন্দ্রদত্ত গানের প্রেক্ষিতে গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ১৯২৫ সালে। কিন্তু তখনও গান রেকর্ড করেন নি নজরুল। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ হয়। এই যোগাযোগ সংঘটিত হয় উমাপদ ভট্টাচার্য নামে এক সংগীত শিল্পীর মাধ্যমে। এ বিষয়ে নলিনীকান্ত সরকার বলেনঃ উমাপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে নজরুলের অন্তরঙ্গতার একটি ইতিহাস আছে। নজরুল যখন বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পান, তখন যে সব স্থানীয় যুবক তাঁকে সংবর্ধিত করেন, তাঁদের অন্যতম উমাপদ। উমাপদ ইংরেজিতে এম.এ.। সুকণ্ঠ গায়ক। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি গানকেই জীবিকা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সদ্যকারামুক্ত নজরুলকে উমাপদ নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দিন কয়েক রেখেছিলেন। এ থেকেই উমাপদের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্টতা জন্মে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে নজরুলের যোগদানের ব্যাপারেও উমাপদের কিছু প্রয়াস ছিল।" (নলিনী কান্ত সরকার, আমার বাড়ীতে নজরুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫)

গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার অনেক আগে থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন। নজরুলের সংগে গ্রামোফোন কোম্পানীর যোগাযোগ বিষয়ে তিনি বলেন, "আমার গান রেকর্ড করার প্রসঙ্গেই আমি যেতাম গ্রামোফোন কোম্পানীর আপার চিৎপুর রোডের ঐ রির্হাসাল বাড়ীতে। সে সময় নজরুলের গান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। আমি তখন বহু জায়গায় নজরুলের গান গেয়ে থাকি। একদিন বিকেলে গ্রামোফোন কোম্পানীর ঐ বাড়িতে গেছি, ভগবতী বাবু, কে মল্লিক প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। প্রসঙ্গক্রমে উঠলো নজরুলের গানের কথা। তাদের অনুরোধে সেখানে

নজরুলের কয়েকটি গান গাইলাম। তাঁরা গানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নজরুলকে একদিন তাঁদের ঐ রিহার্সাল বাড়ীতে আনবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। বোধ হয় পরের দিনই নজরুলকে নিয়ে গেলাম সেখানে। যথারীতি অভ্যর্থনাদির পর নজরুলের গানের আসর বসলো। অনেকগুলো গান গাইলেন নজরুল। সেদিনও নজরুলের গান রেকর্ড করা সম্বন্ধে কোনো পাকা কথা হয়নি। ভগবতী বাবু নজরুলের গান রেকর্ড করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন মাত্র।

তারপর আমার বাড়ীর বেঠকখানায় বসে নজরুলের সঙ্গে ব্যবসায়িক শর্তাদি নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ কে মল্লিকের আবির্ভাব। সে - সময় গ্রামোফোন কোম্পানি লেখকদের বড় একটা আমল দিতেন না। বড় জোর গান পিছু দশটি টাকা দিয়ে আপ্যায়িত করতেন কোন কোন লেখককে। ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয় ঐ দশ টাকা দক্ষিণা দিয়েই কাজ হাসিল করবার চেষ্টায় ছিলেন। কে, মল্লিক সাহেবও নজরুলের কাছে এই প্রস্তাবই করলেন। বাদ সাধলাম আমি আর উমাপদ। আমরা শুনেছিলাম গ্রামোফোন কোম্পানি রবীন্দ্রনাথকে রয়্যালটি দিয়ে থাকেন। নজরুলকে আগে থেকেই শেখানো হয়েছিল যেন তিনি রয়্যালটি ছাড়া অন্য কোন শর্তেই রাজী না হন। নজরুল চিরদিনই বেহিসেবী মানুষ। যখন কোন মুহূর্তে তিনি গ্রামোফোন কোম্পানির শর্তে রাজী হয়ে যান, কিছুই বলা যায় না। এ জন্য উমাপদ নজরুলের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন। রয়্যালটি শর্তে কন্ট্রাক্ট সই না হওয়া পর্যন্ত উমাপদ নজরুলের সঙ্গ ছাড়েন নি।" (নলিনী কান্ত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬)

নজরুল ১৯২৫ সালে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হলেও ১৯২৯ সালেরকোন এক সময়ে তাঁর সঙ্গে সরাসরি চুক্তি হয় গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে। প্রতিভা বসু, রফিকুল ইসলাম ও মাহবুবুল হক তাঁদের গ্রন্থে ১৯২৯ সালের কথাই উল্লেখ করেছেন। প্রতিভা বসু লিখেছেন যে ১৯২৮ সালের জুন মাসে নজরুল ঢাকায় গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি প্রায় দেড় মাস ঢাকায় থাকেন। অতঃপর ১৯২৯ সালে ঢাকা থেকে ফেরার আট দশ মাস পরে নজরুলের ট্রেনিংয়ে প্রতিভা বসুর (রানু সোম) চারখানা গান রেকর্ড করা হয়। গ্রামোফোন কোম্পানিতে কাজ করার সময় নজরুল ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ'র সান্নিধ্যলাভ করেন। নজরুল এ সময় রাগ সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর 'গজল' ছিল সে সময়ে অনবদ্য সংগীত। এই গানেও রাগ সংগীতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেবার আগে থেকেই নজরুল রাগ সঙ্গীত লিখতে শুরু করেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর চীফ ট্রেনার জমীরউদ্দিন খাঁ'র সান্নিধ্যে এসে তিনি রাগ সঙ্গীতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। এ সময় নজরুল 'ঠুংরি' গানেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃতুতে নজরুল শোকাভিভুত হয়ে পড়েন। অতঃপর ১৯৩৯ সালে ওস্তাদ জমীরউদ্দিনের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে নজরুল তাঁর গীত সংকলন 'বনগীতি' উৎসর্গ করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জমীরউদ্দিন খাঁ'র মৃত্যুর পরে গ্রামোফোন কোম্পানি

নজরুলকেই জসীমউদ্দিন খাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। নজরুল এ সময়ে সুরকার, গীতকার এবং প্রশিক্ষক হিসেবে গ্রামোফোন কোম্পানিতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। নজরুল কাব্যরচনা এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্ম ছেড়ে সংগীতেই পূর্ণভাবে আত্ম-নিমগ্ন হয়ে পড়েন। সংগীত রচনায় নজরুলের প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। ক্রমাগতভাবে তিনি গান রচনা এবং সুর দিতে পারতেন। ঝর্ণা ধারার মতো গান বেরিয়ে আসতো। এমন প্রতিভা এ যাবৎকাল কোন কবি এবং গীতিকারের ভিতর লক্ষ করা যায় নি। এর মধ্যে ছিল ফরমায়েশী। যাকে ভাললেগেছে তাকেই উপহার দিয়েছেন তাঁর গান। সে গুলোর কোন অনুলিপি রাখ্যর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি তিনি। বস্তুত, গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান করেই অবিশ্রান্তভাবে তিনি সংগীত রচনা করেন। বাংলা সংগীত ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। এতে নজরুলের কাব্যসাহিত্য সৃষ্টি থেকে সাহিত্যজগৎ বঞ্চিত হয়েছে। কবিতার জগতে থাকলে তিনি আরও মহৎ সাহিত্য রচনা করতে পারতেন। কিন্তু দারিদ্র এবং পারিবারিক অভাবের কারণে সংগীতকেই শেষ পর্যন্ত বেছে নিতে হয়েছিল।

গান ও শিল্পীদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং তাঁদের শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি জন্য অনেক প্রতিভাবান শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুধু নয়, তাঁদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এ প্রসংগে রানু সোম (প্রতিভা বসু) ছিলেন তাঁর একজন স্নেহভাজন শিল্পী। স্মৃতিচারনে তিনি নজরুল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর কিছু বিবরণও রয়েছে। ঢাকায় যাবার পর রানু সোমের সংগে তাঁর বাড়ীতেই নজরুলের পরিচয়। রানু সোমের বাবা-মাও ছিলেন নজরুলের ভক্ত। নজরুলের অগ্রজ বন্ধু দিলীপ রায় বানু সোমদের পরিবারের সংগে যুক্ত হয়ে পড়ে ছিলেন। দিলীপ রায়ের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে নজরুল বানু সোমদের ঢাকার বাড়ীতে কয়েকবার গিয়েছেন। সেখানে তিনি হাতে-কলমে রানু সোমকে গান শিখিয়েছেন। ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে যাবার পর বেশ কয়েক মাস পর পুনরায় নজরুলের সংগে তাঁর দেখা হয়েছিল। স্মৃতিচারণে এ প্রসংগে রানু সোম বলেন ঃ

"উনি (নজরুল) ঢাকা থেকে ফিরে যাবার আট দশ মাস বাদে আমাকেও কলকাতায় আসতে হল। গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে বছরে ছ'খানা গান রেকর্ড করবো এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলুম। এসেই দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। তাঁর সবগান আমার কণ্ঠস্থ। উনি বললেন, আমার গানই রেকর্ড করো। আমি নিজেও তাই স্থির করে এসেছিলুম। আমার মা-বাবারও সেটাই ইচ্ছে। কোম্পানির কর্তাকে বলে ওঁকেই আমার ট্রেইনার হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। আমার ধারনা গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে সেই প্রথম সংযোগ নজরুল ইসলামের। যদি বা তার আগে কোন যোগাযোগ হয়েও থাকে, এতটা ঘনিষ্ট অন্তত ছিল না সেটা জানি।

সেই সময়ে নজরুল ইসলাম আর নলিনী দা (নলিনী কান্ত সরকার) একদিন রেডিয়োর অফিসে নিয়ে এলেন। রেডিও তখন সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না, অডিশন

ইত্যাদিরও কোন নিয়ম ছিলো না, যতদূর মনে পড়ছে নৃপেন মজুমদারই ছিলেন কর্ণধার। তাঁর অনুরোধেই ওঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। নজরুলের গানকে ছড়িয়ে দেবার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিলেন দিলীপ কুমার রায়। কিন্তু তিনি তখন সন্যাসী হয়ে শ্রী অরবিন্দের আশ্রম পণ্ডিতচেরিনিবাসী। কেমন করে যে অবধারিতভাবেই সেই ভারটা আমার উপর ন্যাস্ত হয়ে গেল। আর রেডিয়োর মারফত অতিক্রত অনেক বেশি শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে আনেক বেশি সমাদৃত হবার অবকাশ পেলো। পরের দিন বিভিন্ন কাগজে প্রশংসা বেরুলো অনেক। নজরুল ইসলাম আর নলিনী দা দুজনেই সমান খুশী, সমান উত্তেজিত। এরপর নানা মহলে বসতে লাগল আসর। হিজ মাষ্টারস ভয়েস আঙ্গরবালা ইন্দুবালাকে দিয়েও রেকর্ড করালেন ওঁর গান, এবং ওঁকেই ট্রেইনার নিযুক্ত করলেন। সমস্ত গান দিয়ে নজরুল একখানা গানের বই প্রকাশ করলেন পরের বছর, বইয়ের নাম চোখের চাতক। আমাকে উৎসর্গ করলেন সেই বই।" (প্রতিভা বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০)

বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলেছি, নজরুলের বিষয়ে হয়তো তিনি কিছুটা ঈর্ষাকাতর ছিলেন এবং এ কারণে বোধকরি নজরুলের মতো এমন বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা- সমালোচনা ছিল অনেকটাই তির্যক। বুদ্ধদেব বসু তাঁর স্মৃতিচারণে প্রথম দিকের সম্পর্ককে উচ্ছসিত ভাবে প্রকাশ করেছেনঃ

"কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশি তাঁর গান। একটা হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পানি দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচসাত ঘন্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়। গান তাঁর আন্না নেই; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হলেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা-ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিলো যে আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা শুনেছি। সে-সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন। বাজাতে-বাজাতে গেয়েছেন, গাই গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায়ে এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যেসব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত প্রগতি'তে বেরিয়েছিল। 'আমার কোন কুলে আজ ভিড়লো তরী, এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো/ ছলিতে, নিশিভোর হলো জাগিয়া। পরান পিয়া, এসব গান ঢাকায় লিখেছিলেন বলে মনে পড়ছে। এই মাত্র শেষ করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুণি শুনতে শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধরে যেত।"

অতঃপর নজরুলের গানের পর্যালোচনা করেছেন বয়েস কালে। এই পর্যালোচনা ভালো-মন্দ মিশিয়ে। এটা তাঁর ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগার বিষয় তথাপি এই মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব বসু বলেনঃ " গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি তার গানের। বীর্যব্যঞ্জক গানে চলতি ভাষায় যাকে স্বদেশী গান

বলে - রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পারেই তাঁর স্থান হতে পারে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উৎকার্ষর শিখরস্পর্শী। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তার কবিতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর- গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতি কথনের দোষ প্রশ্রয় পেতে পারে নি, 'বুলবুল' ও 'চোখের চাওকে' কিছু কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশি বলা হয় না।..... শোনা যায় নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি -পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এত বেশি গান রচনা করেন নি। কথাটা অসম্ভব নয় - শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির করমাশে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন করে যচ্ছিলেন - প্রেমির গান, কলীর গান, ইসলামি গান, হাসির গান - সব রচম। সেসব গান বোধ হয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা অনেকে জানি না।' নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যে গুলি ভালো সে গুলি সযত্নে বাছাই করে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, যেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, আবেগ প্রবণ, উদ্দীপনা পূর্ণ, সে কবি শুধুই বীর রসের নন, আদি রসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা না, এমন কি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা সর্বহারার কবি হিসেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কি না জানি না, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিননি পরিয়েছেন, সে মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়।" (বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, ভারবি ১৯৬৬)

বুদ্ধদেব বসু ইংরেজীতে নজরুলকে নিয়ে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন। একটি Modern Bengali Poetry and Nazrul Islam অপর প্রবন্ধটি Modern Bengali Music and Nazrul Islam দুটি প্রবন্ধ ভালো-মন্দ মিশিয়ে নজরুলকে বিচার করার একটি প্রচেষ্টা দেখেছি। কবিতার স্থায়িত্ব থেকে গানের কালজয়ী হওয়ার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস রয়েছে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত পণ্ডিত। নিজেও একজন কবি। কবিদের রচনায় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবেই। জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতায় গুরু-চণ্ডালী দোষ দেখা যায়। কখনও সখনও শব্দ চয়নে তিনি নিজস্বতাকে জোর দিয়েছেন। নজরুল প্রকৃতির মতো সৃজনশীল একজন কবি। সৃষ্টির মধ্যে সুন্দর অসুন্দর রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রকৃতি সুন্দর। তবে একথা সকলেই স্বীকার করেন যে নজরুল রবীন্দ্রনাথের পরে একজন নূতন ধারার কবি। কবিতা, গানে কিংবা তাঁর ছোটগল্প এবং উপন্যাসে তিনি কাউকে অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নি। লেখাগুলোকেও পরিমার্জন করেন নি। প্রকৃতির মধ্যেও এমনটি দেখা যায়। নজরুলের সমকালে কিছু কিছু পণ্ডিতমনস্ক মানুষ নজরুলকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু নজরুল সংশোধন বা পরিমার্জন কিছুই করেন নি এবং করতে চান নি। তিনি সকলকে অনুরোধ করেছেন, তাঁর সব ত্রুটি-বিচ্ছুতি নিয়েই যেন তাঁকে বোঝার চেষ্টা করা হয়।এখানেই নজরুলের বিশিষ্টতা। এখানেই তিনি নজরুল।

দিলীপ কুমার রায় ঃ

বুদ্ধদেব বসুর আগেই যিনি নজরুলের গান নিয়ে আলোচনা শুধু নয় - গান গেয়েই যিনি নজরুলকে পরিচিত করে তুলেছিলেন গণমানুষের কাছে যিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গুণীপুত্র দিলীপ কুমার রায়। করুণাময় গোস্বামী, নজরুলের গানকে নিয়ে লেখা 'নজরুলগীতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে দিলীপ কুমার রায় ও নজরুলকে গানের ভুবনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্রও সাহিত্যের নানা শাখায় গভীর পরিদর্শিতার অধিকারী দিলীপ রায় ছিলেন সংগীত রচয়িতা ও উচ্চমানের গায়ক। নজরুলের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল। কলকাতার রসজ্ঞ সমাজে নজরুলের গানকে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি এক ঐতিহাসিক ভুমিকা পালন করেছিলেন। নজরুলের গজলের লঘু রাগ সাংগীতিক চালে তাঁর মন মজেছিল। শুরুর ঘটনা এই; পরের অবশ্য তিনি নজরুলের নানা ধরনের গানই গাইতেন। বাংলায় উর্দু গজলের মতো গজল রচনা করা হোক এ ছিল তার প্রত্যাশা। নানা প্রসঙ্গে দিলীপ রায় তাঁর এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করতেন। তাঁর ধারণা ছিল শ্রেষ্ঠ ফার্সি কবিদের গজল রচনার উজ্জ্বলতা বাংলায় প্রতিফলিত হতে পারে। নজরুল যখন গজল রচনা করলেন এবং তা যখন সত্যি এক বিশিষ্ট রূপবন্ধ হিসেবে বাংলা কাব্য-সংগীতের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গেল তখন দিলীপ রায় পরম আদরে তাকে তাঁর কণ্ঠে তুলে নিলেন ও স্বয়ং এই গানের প্রচারকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তিনি বহু আসরে এই নব সংগীত পরিবেশন করেছেন এবং এর বৈশিষ্টাদি ব্যাখ্যা করেছেন। নজরুলের গজলের বৃহত্তর প্রচার যাতে সম্ভব হয় তার জন্য স্বরলিপি করা ও স্বরলিপি সাময়িক পত্রে মদ্রণের ব্যাপারে দিলীপ রায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

অশেষ ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নজরুলের কয়েকটি গজলের স্বরলিপি করেন। দিলীপ রায়ের উদ্যোগেই রবীন্দ্রসংগীত পরিমণ্ডলে নজরুলের গানের প্রবেশ ঘটে এবং সাহানা দেবী ও স্বয়ং দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর এ ব্যাপরে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। বহু আসরে সাহানা দেবীকে নজরুলের গানকে গাইতে দেখা যায়। এটা খুবই দুঃখজনক যে জীবন পূর্বাহ্নেই দিলীপ কুমার রায় সংসারত্যাগী হয়ে পাণ্ডিচেরিতে অরবিন্দ আশ্রমে যোগদান করেন। তবু সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয় নি। নজরুলের জন্য যেমন নজরুলের গানের প্রতিও তাঁর ভালবাসা আজীবন অটুট ছিল।

স্মৃতিকথায় তিনি লেখেনঃ "কাজী ছিল শুধু আমার প্রিয় বন্ধু নয়, প্রায় ছোট ভাইয়ের মতো অন্তরঙ্গ আত্মীয়। তার সঙ্গে যতই মিশেছি, ততই তাকে আরো বেশি ভালবেসেছি। এমন দিলদরিয়া, স্নেহশীল, বন্ধুবৎসল, সদাশয় নিত্যানন্দ, প্রাণোচ্ছল মানুষ আমি বেশি দেখিনি বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে মানুষ অনেক সময়েই ঝিমিয়ে পড়ে যৌবন না পেরুতেই। কাজীকে দেখে আমার প্রায়ই মনে হত রবীন্দ্রনাথের চির সবুজের গান ঃ

চির যুবা তুই যে চিরজীবি
জীর্ণঝরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।'

বলতাম ওকে ঃ "কাজী তুমি কোনদিন বুড়ো হবে না, তোমার মাথার ঝাঁকড়া চুলে পাঁক ধরলেও মন তোমার চলবে যৌবনেরই ঘোড়শোয়ার হয়ে।"

সে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলত ঃ "তাইতো আমি আপনার ছোট ভাই বনতে পেরেছি দিলীপ দা, হা হা হা।" এক কথায় সনাতন গতানুগতিকতার ও অকালবার্ধক্যের সে ছিল যেন মুক্তিমান প্রতিবাদ। সে যখন হো হো করে ছাদ ফাটা হাসি হাসত তখন তার সে উল্লাসের উলুধ্বনিতে গম্ভীরাননেরাও সাড়া না দিয়ে পারতেন না। সুকুমার রায়ের ভাষায়, কাজী কোনদিন নাম লেখায় নি রামগরুড়ের ছানাদের দলে - হাসতে যাদের মানা" ..... ওর নানা কবিতা সুন্দর হলেও ওর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে ওর গানেই বলব। এ কথায় ওর অনুরাগীদের ক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথও কি বলেন নি যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর গান। কাজীর সম্বন্ধেও এ কথা। আর সেই জন্যেই আমার মনের সঙ্গে ওর মনের সুর পুরোপুরি মিলত এসে এই গানেরই অন্দর মহলে, কবিতার রঙমহলে নয়।"

দিলীপ কুমার রায় এর পরে নজরুলের গান সম্বন্ধে বলেন ঃ "দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বাংলা গানের দিকপাল। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা কীর্তন বাউল ও বহুভঙ্গিম প্রেমের গানের স্বদেশী গানে তাঁর দান যে অসামান্য আজ সবাই স্বীকার করেন। কিন্ত তাঁর গানে ঠুংড়ির চাল মেলে না, পেলবতা ও সৌকুমার্যের সমন্বয়ে। বাংলায় এ চাল প্রথমে আনেন অতুল প্রসাদ। তাঁর সম্বন্ধে অন্যত্রে আমি বহু আলোচনা করেছি। কাজীর সম্বন্ধে করেছি আমার দুটো নিবন্ধে। তাতে দেখাতে চেষ্টা করেছি কীভাবে আমাদের বাংলা গানকে ও সমৃদ্ধ করে গেছে গজলের প্রেমের দুলকি চালে। এর পরে ঠুংড়িতেও অনেকগুলি গান বাঁধে অতুল প্রাসাদের পদাঙ্ক অনুকরণ করে। কিন্ত সে গুলি চমৎকার হলেও গানে ওর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছিল সব চেয়ে বেশি ওর বাংলা গজলেই বলব। আমার বিশেষ প্রিয় ছিল ওর একটি গজল সেটি ভ্রাম্যমান হয়ে সর্বত্র গিয়ে আমি বহু শ্রোতাকেই সচকিত করে তুলেছিলাম ঃ 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।' এ- গানটি একদা প্রায় আমার 'রাঙা জাবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো'র মতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই গানটির জন্যেই ও আমাকে পরে ওর গজল গুচ্ছ 'বুলবুল' উৎসর্গ করে।" (দিলীপ কুমার রায় ..... নজরুল কথা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকতা ১৩৮০, পৃ.)

করুণাময় গোস্বামী দিলীপ কুমার রায়ের মন্তব্য যে নজরুল ঠুংড়িতে অনেকগুলি গান রচনা করেন অতুল প্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে-এ কথা মানতে রাজী নন। তাঁর আপত্তি এ কারণে যে নজরুল ঠুংড়ির ধারাটি অতুল প্রসাদের কাছে থেকে পান নি। অতুল প্রসাদ লাখনৌয়ে থাকতেন। ঠুংড়ি ও গজলে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিন্ত তিনি

কলকাতায় এসে কেবলমাত্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে মিশতেন। অন্যাদের সঙ্গে নয়। করুণাময় গোস্বামী মনে করেন ঠুংড়ির দিক পাল ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ'র কাছ থেকেই নজরুল ঠুংড়ির ধারাটি পেয়েছিলেন। ওস্তাদ জসীমউদ্দিন খাঁ তাঁর স্মৃতিকথায় তা লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর কাছ থেকে ঠুংড়ি শিখে নজরুল বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

বস্তুত, নজরুল 'গজল'কে একটি সুন্দর পর্যায়ে নিয়ে এসেও এসেছিলেন। 'গজল' গান সম্পর্কে কয়েকটা রেকর্ড বেরুলে নজরুল রসিক শ্রোতাদের মন জয় করেন। বাংলার সংগীতের ইতিহাসে 'গজল' গান ছিল একটি নূতন সংযোজন। গজল গানের জন্য নজরুল প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। নজরুলের 'এত জল ও কাজল চোখে' ঠুংরি মিশ্রিত গজল গান বাঙালীর মনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। গানটি দিলীপের অনুরোধে নজরুল লিখেছিলেন এবং দিলীপ রায়ের খাতাতেই এই গানটি তিনি লিখেছিলেন। দিলীপ রায় এ খাতাটিও সংরক্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দিলীপ কুমার রায় একটি চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তিনি বলেন যে নজরুলের 'এত জল ও কাজল চোখে পাষানী আনলো বলো কে' শুনে অতুল প্রসাদ সেন একটি গজল লিখেছিলেন ঃ

জল বলে চল মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল হবে না বিফল ।'

নজরুল ছিলেন অসাধারণ গীতকার এবং শিল্পী। কেউ কোন নূতন গানের অনুরোধ করলে নজরুল সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে ফেলতে পারতেন। এমন ক্ষমতা খুব কম গীতিকারের আছে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ রায় বলেনঃ একদা আমার থিয়েটার রোডের বাড়িতে ওকে বন্দী করে ওর হাতে কলম দিয়ে বলিঃ 'কাজী ভাই শরৎ সংবর্ধনা আসন্ন তোমাকে কতবার বলেছি লিখতে একটি গান।

সময় পাইনি দিলীপ দা।

কিন্তু আজতো পেয়েছো? লেখো। বলে ওকে এক ঘরে পুরে তালা চাবি দিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম। ও আধঘন্টার মধ্যে লিখে দিলে একটি গান যা আমি শরৎচন্দ্রের সামনে গেয়েছিলাম। গানটির প্রথম চরণ ছিল (এটাও গজল)ঃ

কোন শরতে পূর্ণিমা চাঁদ
আসিলে এ ধরা তলে।

দিলীপ রায় ছিলেন নজরুলের প্রাণপ্রিয় বন্ধু। উভয়ে উভয়কে ভালবাসতেন। নজরুলের গান যে দিলীপ রায় আন্তরিক ভাবে গাইতেন নজরুল তা বুঝতেন। নজরুল তাঁর 'বুলবুল' কাব্য গ্রন্থের প্রথম ভাগ দিলীপ কুমার রায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখেন ঃ

যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে
ওগো গুণী, তুমি ছড়াইলে তারে সব বুকে, সবখানে

বুকে বুকে আজ পেয়েছে আশ্রয়, আমার নীড়ের পাখী
মুক্ত পক্ষ উড়িতে যে চায় কেন তারে বেঁধে রাখি?

দিলীপ রায় বলেন, "কাজীর গান! সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে রামমোহন লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধুর পদার্পণ। তার পরেই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাকড়া চুল দুলিয়ে গাওয়া ঃ

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল

রামমোন লাইব্রেরীতে, ওভারটুন হলে ও ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে আমি মাঝে মাঝেই চ্যারিটি কনসার্টে দিতাম নানা অর্থাথীর সাহায্যার্থে। সেবার ছিল বোধ হয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে-ঠিক মনে নেই। তবে এটুকুতো ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন - বিশেষ যখন সে গাইলঃ

ও রে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝনঝনা
ও যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা
মোদের অস্থি দিয়ে জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেইদেবতার রাজ্যরক্ষা হয়েছিল। এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে? এই উপমার প্রেরণা আসে উপর থেকে - যাকে শ্রী অরবিন্দ তাঁর ফিউচার পোয়েট্রিতে নাম দিয়েছেন শ্রুতি। ঠিক এমনি প্রেরণা নেমে এসেছিল তাঁর বিদ্রোহী মনে বিদ্রোহ বন্দনায়ঃ

আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভুমে রণিবেনা
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

..... কিন্তু যা বলছিলাম। দেশবন্ধুর চোখে জল চিক চিক করে উঠল, সুভাষের মুখ উঠল দীপ্ত হয়ে। এর পরে কাজীর মুখে 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি শুনেও সুভাষ মুগ্ধ হতো বরাবরই। ..... কাজী 'বিদ্রোহী' কবি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। তাই বুঝি তার বিদ্রোহে মানুষের মনে ছোঁয়াচ লাপত এত ব্যাপকভাবে। কত সভায় এবং চ্যারিটি কনসার্টেই না সে আমাদের গানের পরে এই ভাবের নানা গান গাইত ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ভাঙা গলায়। কিন্তু এমন গাইত যে, ভাঙা গলাকেও ভাঙা মনে হত না আগুন ছুটিয়ে দিত সে। এমন প্রাণোস্মাদী গায়ক কি আর দেখব - এ মন মরা যুগে? সাত্যি আমাদের অবাক লাগত ভাবতে ভাঙা গলায়ও কাজী কোন জাদুতে এমন অসম্ভব কে সম্ভব করত দিনের পরে দিন - ভাবের ঢলে পাথরের বুকে আলোর ঝর্ণা বইয়ে।

এক টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে গেলঃ সুভাষ একবার আমাকে বলেছিলঃ ভাই জেলে যখন ওয়ার্ডার লোহা দরজা বন্ধ করে, তখন মন কী যে আকুলি বিকুলি করে কী বলব। তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর এই গান?

কারার এই লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট

রক্ত জমাট শিকল পুজার পাষাণবেদী। (দিলীপ কুমার রায়, বাক সাহিত্য প্রাঃ লিঃ ১৯৭০, পৃ. ২৫০-২৫৬)

দিলীপ আরো বলেনঃ মান্দালয় থেকে একটি পত্রে সে কতকটা আভাষ দিয়েছিল একবার। লিখেছিল ২মে, ১৯২৫

I do not think that I could have looked upon a convict with the authentic eye of sympathy had I not lived personally as a prisoner. And I have not the least doubt that the production of our artist and litterateurs, generally, would stand to gain in ever so many ways could they win to some new experienec & prison life. We do not perhaps realise the magnitude of the debtowed by Kazi Nazrul Islam's verse to the living experience he had of jails.

এ কথা পুরো পুরি সত্য হোক বা না হোক এ কথ্য নিঃসঙ্কোবে বলা চলে যে, জেলে না গেলে কাজী কখনই লিখতে পারত না এমন প্রাণ জাগানিয়া চরণ ঃ

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়
সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

সেদিনও দিল্লীতে নেতাজী স্মৃতি সভায় গেয়েছিলাম (ডিসেম্বর ১৯৬৩) কাজীর একটি গান, যা সুভাষ অত্যন্ত ভালবাসতঃ

দুর্গম গিরি কান্তার মুরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার।

কাজী যখনই এ গানটি গাইত মনে পড়ে সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হয়ে উঠত, বিশেষ করে সে শেষ স্তবকের দুটি অমর চরণ ধরতে না ধরতে ঃ

ফাঁসির মঞ্চে গেয়েগেল জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান?

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার এ চরণটি ধরতে ধরতে মন সম্ভ্রমে উল্লাসে ভরে ওঠে। এ জাতীয় চরণ কলাকৌশলে আসে না কাব্য সাধনায়ও নয় - আসে কেবল

কল্লোলোকের প্রেরণার অবতরণে।" (দ্র. করুণাময় গোস্বামী, নজরুলগীতি প্রসঙ্গ, ঢাকা জানুয়ারী ১৯৭৮ পৃ. ৫৯০-৫৯১)

বাস্তবিক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নজরুলকে একজন অসাধারণ মানুষ বলে জেনেছিলেন। কলকাতায় নজরুলের জাতীয় সংবর্ধনায় সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন।

"স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নাই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তা ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব - কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন ; কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম - অনা স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল- জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ। তার লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রানময়ি কবিতা লিখতে পারিনা।

নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয় - এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাব - তখন সেখ্যনে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়ার হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়াই, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি -কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয় - সমগ্র বাঙালী জাতির।" (মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, জুন ১৯৮৮ পৃ. ২৩৮-২৩৯)

সুভাষচন্দ্র বসুর এই বক্তব্যের পর মনে হয় আর কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাকামী মানুষদের জন্য নজরুল গুরুত্ববহ ছিলেন। কিন্তু আমরা দুঃখের সংগে লক্ষ করি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে অদ্যাপি নজরুল বুঝি তাঁর স্বদেশেই নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঁচে থাকলে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান তাঁরা নজরুলকেই প্রাদন করতেন। কিন্তু তাদের উত্তসুরীরা তা করেন নি।

করুণাময় গোস্বামী দিলীপ রায়ের নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা চিঠি সম্পর্কে বলেনঃ "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি মূল্যবান অনুধাবন তুলে ধরেছেন

দিলীপ রায় মান্দালয় থেকে লেখা তাঁর পত্রাংশ উদ্বৃত করে Living experience he had & jails বলে তিনি নজরুলের সংগ্রামী রচনাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। তা হচ্ছে এ বিষয়ে নজরুল ইসলাম যা রচনা করেছেন তাঁর সঙ্গে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনুভূতির সম্পর্ক রয়েছে। আবার বলব যে, নজরুল সম্পর্কে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। ইংরেজ শাসন বিরোধী তাঁর সেসব রচনা, সেসব আন্দোলন থেকে নিরাপদ দূরুত্বে অবস্থানকারী কোন কবির রচনা নয়, নিজে আন্দোলনে অংশ গ্রহন করছেন, জেল ঘাটছেন, জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, দীর্ঘ অনশন পালন করছেন, এমন কবির রচনা সে সব। সুতরাং এ একেবারে প্রাণের গভীর থেকে প্রত্যক্ষ প্রেরণায় বেরিয়ে আসা বস্তু। এই বৈশিষ্ট্যটুকু নজরুলের গান কবিতা বা অন্যান্য রচনার ব্যাপারে খুবই লক্ষ করবার মতো।" (করুণাময় গোস্বামী প্রাগুক্ত,)

করুণাময় গোস্বামী নিঃসন্দেহে যথার্থভাবে নজরুলকে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান এ কারণে যে তিনি নিজের কথা যেমন বলেছেন তেমনি নজরুলের সমকালে যাঁরা কবিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং একই সালে তাঁর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মতামতও প্রকাশ করেছেন। এ জন্যেই গ্রন্থটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। দিলীপ কুমার রায় নজরুলকে খুব নিকট থেকে দেখেছেন। নজরুলের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ "কাজীর ছিল এই শ্রেণির শিশু সরল মন - স্বভাব প্রবুদ্ধ কবি প্রাণ, সহজ বিশ্বাসী আন্তর ও সর্বোপরি অসামান্য প্রতিভা, যার আহবানে দিগন্তে অসীমের শুভ্রলোকের সঙ্গে সত্যের অসীম আধারের মিলনবাণী তার মনে জন্ম নিত, অনন্যতন্ত্র ছন্দ - ভাষার কল্পলোকে।" দিলীপ কুমার রায়, আলোর বাণী বহ নজরুল, দ্র. করুণাময় গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২)

নজরুলের গান ছিল বিচিত্রগামী। দেশত্মবোধক গান, গজল, রাগসংগীত, ধর্মীয় সংগীত, আধুনিক গান, লোসংগীত, হাসির গান, প্রকৃতি বিষয়ক গান, হিন্দী গান। করুনাময় গোস্বামী নজরুলের গান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। নানা তথ্য রয়েছে এ গ্রন্থে। নজরুল সম্বন্ধে দু একজন সমালোচনা করেছেন। কিন্তু অন্য সকলেই নজরুলের অসাধারণ কর্মকাণ্ডকে অর্থাৎ তাঁর গান কেই অন্য সকলের গান থেকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গানে শিল্পীর তেমন কোন স্বাধীনতা যে নেই, নজরুল তার ব্যাতিক্রম রয়েছে। দিলীপ কুমার রায় এই স্বাধীনতা নিয়েছলেন। গায়কী এবং সুর তাঁর নিজস্ব ছিল। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে নজরুল নিজেই সুর দিয়েছেন এবং কেমন করে গাইতে হবে তাও জানিয়ে দিয়েছেন। তথাপি আরো কেউ কেউ তাদের নিজস্ব ঢঙে গান গেয়েছেন।

নজরুলের গানের এত ব্যাপকতা যে এ সম্পর্কে লিখতে গেলে বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। আমার উদ্দেশ্য, নজরুলের গান তাঁর সমকালে কিভাবে সমাজে গৃহীত হয়েছিল এবং গুণীজনদের প্রতিক্রিয়াও কেমন ছিল সেটাকে তুলে ধরা।

নজরুল যে ভক্তিমুলক গান করেছেন তাঁর পেছনে নজরুল পুত্র বুলবুলের প্রভাব ছিল। বুলবুলের মৃত্যু ছিল নজরুলের জন্য বড় আঘাত। এ সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ বলেনঃ "১৯৩০ সালের মে মাসে নজরুলের পুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে মারা যায়। আমি নিজে তখন কলকাতায় উপস্থিত ছিলাম না। যাঁরা তখন কলকাতায় ছিলেন তাঁরা দেখেছেন যে কী গভীর স্নেহ ও আসক্তি নজরুলের পুত্রের প্রতি ছিল। পুত্র শোক ভোলার জন্য সে তখন অনেক চেষ্টা করেছে। কবি জসীমউদ্দীন লিখেছেন, তিনি তখন নজরুলকে একদিন খুঁজে পেলেন ডি. এম, লাইব্রেরীর দোকান ঘরের একটি কোণে। পুত্রশোক ভোলার জন্যে সে সেখানে বসে বসে হাসির কবিতা লিখছিল এবং কেঁদে কেঁদে নিজের চোখ ফুলিয়ে ফেলছিল। এত করেও নজরুল বাঁচতে পারল না, শোকাতুর পিতার মনে যে দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল তার নিকট সে ধরা দিল।"

এর পরেই তাঁর মনে আধ্যাত্মিকভাবের সঞ্চার হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে, দিলীপ কুমার রায় বলেন, "..... এর পরেই তাঁর জীবনের মোড় ফিরল ভক্তি সাধনার দিকে। ফলে একের পর এক কত গানই সে বাঁধল। আমি ঠিক এই সময়েই পণ্ডিচেরি প্রস্থান করি বলে কাজীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর হয় নি। পণ্ডিচেরি থেকে এসে একবার মাত্র তার সঙ্গে দেখ্য হয়েছিল বড় শোকাবহ পরিবেশে। .....

কাজীর কবিমন বিকশিত মনের কোঠায় পড়ে। তাই তো তার জীবনের যশের দীপ্ত শিখর মুহূর্তেও এই ছায়ার সুর বারবার বেজে উঠত যে জীবনে সবকিছু পেলেও মন হাৎড়ে বেড়ায় এমন কিছু পেতে, যা না পেলে সব পাওয়াই ব্যর্থ মনে হয়, মানুষকে হাজার ভালবাসলেও তার পরে পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। তাই হে পরম অচিন -চেনা বন্ধু। তুমি এস, না এলে মিটবে না আমার পিপাসা, সংসারের নিটোল সমৃদ্ধির মাঝেও মনে হবে নিজেকে নিঃস্ব যাই কেন রচি বহু যত্নে হয়ে উঠবে তাসের ঘর, নীড় হয়ে উঠবে করাগার। তাই গাইলো সে যশের জয়াভিযানের আলোকলগ্নেই (গীতিগতদল)ঃ

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু, আর তো হবনা পথ হারা, বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়, তুমি একা জাগো ধ্রুব তারা। ভ্রান্তপথের ভ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে, আরো যাহা কিছু আছে মোর প্রিয় লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে, কী হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কী হবে লয়ে এ - তাসের ঘর?। ছুঁতে ভেঙে যায় তবু শিশুপ্রায় ভুলাও মোদের নিরন্তর। (দিলীপ কুমার রায়, আলোর বাণী বহ নজরুল, দ্র. করুনাময় গোস্বামী, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭৭)

এখানে নজরুলের গানের ভূবনে যাঁরা জড়িয়েছিলেন এবং নজরুলকে যাঁরা বন্ধু, সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন এবং তাদের সাথে যারা নজরুলের গান গেয়ে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁদের স্মৃতিতে নজরুল কেমন ছিলেন সে সম্বন্ধে আলোকপাত করা হল। নজরুল যে কত বড় মহৎ শিল্পী এবং মহৎ মনের অধিকারী ছিলেন এ-সব বক্তব্যে তা প্রকাশ পেয়েছে।

শৈলজানন্দ ঃ

কবিবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'সুরসভায় নজরুল' শীর্ষক স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন ঃ আমার চিরকালের ইচ্ছা ছিল আমার সমস্ত ছবির মিউজিক ডিরেকটর হবে নজরুল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমার সব ছবিরই মিউজিক ডিরেকশন তাকে দিতে পারিনি। তার একমাত্র কারণ ছবির সংগীত পরিচালনা, সমস্ত মনপ্রাণ এবং অবসর দিয়ে ছবিটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য ছবির গল্পের প্রতিটি ভাবসম্পদ সুরের ইন্দ্রজালে নানান বৈচিত্র্যে ভরে দিতে হবে।

নজরুল তখন এইচ. এম. ভি. গ্রামোফোন কোম্পানির ট্রেনার এবং সংগীত রচয়িতা। তখন তার বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না ছবির জগতে প্রবেশ করবার। তাছাড়া আমার প্রত্যেকটি ছবির মালিক ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁদের মর্জিমাফিক অনেক সময়ে আমাকে চলতে হতো। তাঁদের মনোনীত রচয়িতা এবং সুরকার প্রত্যেকটি ছবির সংগীত পরিচালক হতেন।

সংগীত জগতে আমি একেবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এই ছিল তাঁদের ধারণা। ..... ছবিতে নায়ক-নায়িকার মুখে গান থাকবে কিনা, এবং থাকে যদি, তবে কোন পরিবেশে থাকবে, গানের ভাষা কি ধরণের হবে বা গানের কথা ও সুরের ভিতর দিয়ে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের অভিব্যক্তি বোঝানো যবে কিনা অথবা আবহসংগীত কেমন হবে সেটা কাহিনীকার এবং পরিচালকের জানা একান্তই প্রয়োজন। আমি যতবার যত ছবি করেছি তাতে এই বিষয়টির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছি এবং উপলব্ধি করেছি। নজরুলের সঙ্গে একদিন এই বিষয়ে পরামর্শ করব ঠিক করলাম।

এই জন্য একাধিক দিন এইচ. এম. ভি - এর রিহার্সালরুমে আমি গিয়েও ছিলাম। যেদিনই গেছি সেদিনই দেখেছি যে সে যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত। সুরের রাজ্যে একেবারে তন্ময় হয়ে ডুবে আছে। চারিদিকে তাঁকে ঘিরে বসে আছেন সে সময়ের সব খ্যাতিমান সংগীতশিল্পীর দল। তাঁরা অনেকে আজ হয় লোকান্তরিত হয়েছেন অথবা সংগীতজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকজনের কথা আমার মনে পড়েছে কারণ এই জন্য সে নজরুলের গানের সঙ্গে বা নজরুলের সংগীতজীবনের সঙ্গে এরা নিজেদের অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। নজরুলের গান যে আজ এত প্রচারিত হয়েছে তাঁর জন্য এদের অবদানও কিছু কম নয়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সংগীত- সম্রাজ্ঞী আঙুরবালা, ইন্দুবালা, চিত্তরায়, শচীনদেবর্মন, গিরীন চক্রবর্তী, ধীরেন দাস, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, আব্বাসউদ্দিন আহমদ, মৃণালকান্তি ঘোষ, কমলদাশগুপ্ত প্রমুখ। নজরুল সুরের বৈচিত্র্য তাঁরা এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, এক এক সময় তাদের গান শুনে তন্ময় হয়ে যেতুম। নজরুলের গান এদের ছাড়া অন্য কোন শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ানোর কথা চিন্তাও করা যেত না।

একদিন গিয়ে দেখি শচীনদেবর্মন মশাই একা নজরুলের কাছে বসে আছেন। আজকের দিনের ভারতবিখ্যাত শিল্পী ও সুরকার শচীন দেবর্মন তখন সংগীতের জগতে সবে প্রবেশ করেছেন। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে প্রথম গান শিখতেন সুরকার শচীনদেব। তারপর তালিম নিতে এলেন নজরুলের কাছে। নজরুলের গানে এবং সুরে তিনি এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর সেদিনের সে তন্ময়তা ও একাগ্রতা ভোলবার নয়। কী এক অজানা আকর্ষণে দিনের পর দিন নজরুলের কাছে ছুটে আসতেন তরুণ গায়ক শচীনদেব। যেন সুরের রাজার পাশে সুরকুমার।

আমি তখন 'নন্দিনী' ছবি করছি। সেই ছবিতে নজরুলের একটি গান অন্তত দিতেই হবে এই সংকল্প নিয়ে গিয়েছিলাম নজরুলের কাছে। গান তার তৈরীই ছিল। পল্লীসুরের গানঃ 'চোখ গেল পাখীরে' শিল্পীও তাঁর সামনেই বসে। ঠিক হল শচীনদেবই গাইবেন এই গান। শিল্পীকে শেখানো সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অসুবিধা বাধলো প্রথম লাইনেই। শচীনদেব বাবু ছিলেন পার্বত্যত্রিপুরার রাজকুমার। বিরাট একটা সংগীত প্রতিভা আর অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ থাকা সত্ত্বেও নিখুঁত বাংলা উচ্চারণে তাঁর মাঝে মাঝে অসুবিধা হতো।

'চোখ গেল, চোখ গেল' বার বার তিনি বলতে লাগলেন চো-গেল,চো-গেল'। খ উচ্চারণটি সাইলেন্ট হয়ে যেতে লাগল। নজরুলেও কিছুতেই ছাড়বে না। স্পষ্ট পরিষ্কার প্রাঞ্জল উচ্চারণ চাই। প্রায় আধঘন্টা ধরে দুজনের কসরৎ চললো। শচীনদেবও চো-গেল বলতেন আর নজরুলও চোখ গেল বলাবে। গুরু এবং শিষ্যের সে কী নিষ্ঠা। সত্যই শচীনবাবু বুঝতে পারছেন তাঁর বার বার উচ্চারণে ভুল হচ্ছে অথচ গাইবার সময় শোধরাতে পারছেন না। সেদিন শচীনদেববাবুর ভিতর যে নিষ্ঠা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম তা আজও আমার স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শেষে ঠিক হল ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে গানটি রেকর্ডিং হবে আর নজরুল স্বয়ং উপস্থিত থাকবে। আমি সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম--এত কাজের মাঝখানে সেটা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে, না ছবির সংগীত পরিচালক সুরসাগর হিমাংশু দত্ত মশাইকে দিয়ে কাজটা চালিয়ে নেব।

সুরসাগর হিমাংসু দত্তের ওপর নজরুলের ছিল অগাধ ভালবাসা আর হিমাংশু বাবুও নজরুলকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। যথা সময়ে নজরুল গিয়ে উপস্থিত। মাথায় একমাথা বাবরি চুলের গুচ্ছ দুলিয়ে অট্টহাসি হেসে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললে -আমি এসেছি। সুরসাগর কোথায়? চাঁটগেয়ে এসেছে তো? (শচীনদেবকে নজরুল আদর করে চাঁটগেয়ে বলতো)। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে - তোমার ছবিতে এই গান আমি নিখুঁত করে গাইয়ে দেবো। চল স্টুডিওর ভেতরে যাই। ভেতরে শচীনবাবুও প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। আবার চললো সেই কসরৎ। প্রায় আধ ঘন্টা চেষ্টার পর সফল হলেন কুমার শচীন দেব। আমার ছবিতে সেই তাঁর জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাক। আমারই সামনে

আমার 'নন্দিনী' ছবির জন্য রেকর্ড করা হয়, নজরুলের সেই দুটি কালজয়ী গান ঃ 'চোখ গেল, পাখিরে' আর 'ও পদ্মার ঢেউ রে'। সে দুটি গানের ভেতর কুমার শচীনদেব বর্মন আজও চির নতুন হয়ে আছেন। আর সে গান দুটি নজরুল আর শচীন দেবের এক অমর সৃষ্টি, যুগ্ম প্রতিভার এক অম্লান স্বাক্ষর।" (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'সুরসভায় নজরুল,' "নজরুল কথা" বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতাঃ সাহিত্যম, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, পৃষ্ঠ ১১৫-১১৭)

আঙুরবালা ঃ

স্মৃতিচারণে আঙুরবালা জানিয়েছেন ঃ "আমার পরমশ্রদ্ধেয় কাজীদার স্মৃতিকথা লিখতে বসে আজ অজান্তে মনের ভেতর অনেক হারানো ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে। ফুটে উঠছে অনেক স্মৃতির রঙ-বেরঙের ছোট বড় ফুল। সে ফুলের সুবাস জনে জনে বিলিয়ে দেবার জন্য আজ আমি কলম ধরেছি।

চিৎপুর ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ইস্কুলের সামনে ছিল বিষ্ণুভবন। তখনকার গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুম। আর ভগবতী ভট্টাচার্যমশাই ছিলেন কোম্পানির ইনচার্জ।

একদিন ভগবতীবাবু আমাকে কাজীদার কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখার আগে অনেক নাম শুনেছি। কাজী নজরুল ইসলাম মস্ত বড় কবি। কবিতা লিখে কাগজ বার করে জেল খেটে এসেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁর লেখা কবিতার বই বাজেয়াপ্ত করেছে--এসবই আমরা আগে থেকে শুনেছিলাম। তাই এত বড় মানুষটির কাছে যাবার আগে মনটাকেও তৈরী করে নিয়েছিলাম বৈকি। যাবার আগে মনে মনে কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কাল্পনিক ছবিও যে আঁকিনি, তা নয়। সে ছবিতে এঁকেছিলাম একটি অগ্নিগম্ভীর মানুষের মনের আঁচ।

কিন্তু সামনে গিয়ে সমস্ত কল্পনা আমার দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নেভার মতো নিভে যেতে দেরী হলো না। কোথায় তাঁর নামের অহংকার আর কোথায়ইবা তাঁর বিদ্রোহী কবির গাম্ভীর্য। এ যে দেখি বাঁধভাঙা হাসির বন্যায় সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যান। মুখের হাসি যদি বা থামে, কিন্তু ওই বড় বড় দুটি চোখের হাসি! সেতো থামে না।

প্রথম দিনেই কাজীদাকে দেখে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এলো। শিশুর মতো দেখলাম তাঁর সরল মন, কিন্তু হিমালয়ের মতো মহান ব্যক্তিত্ব। আর হাসি, কত বড় দয়াল মন হলে তবে ওই রকম করে সব ভোলানো হাসি হাসতে পারা যায়। তাঁর সেই সুন্দর সৌম্য মূর্তি, প্রাণখোলা হাসি আমার খুব ভালো লাগতো। আর কী সুন্দর সুন্দর বৈঠকী গল্প বলতে পরতেন কাজীদা। শুনেছি শরৎচন্দ্র নাকি খুব সুন্দর হাসির বৈঠকী গল্প বলতে পারতেন, তা আমাদের কাজীদাও তাঁর চেয়ে কিছু কম ছিলেন না গল্প বলায়। তিনিও খুব রসিক মানুষ ছিলেন।

কাজীদা গ্রামোফোনে আমাদের জন্য তাঁর নিজের গানের ট্রেনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমাকে তিনি প্রথম গান দিয়েছিলেন 'ভুলি কেমনে আজও যে মনে বেদনা সনে রহিল

আঁকা।' তারপর 'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বলো কে'। কাজীদা বাংলা গজল গানের স্রষ্টা। আমি তাঁর নিজের সুরে অনেক গানই রেকর্ড করেছি। তাঁর গানের জগতের প্রত্যেকটি জিনিসই ছিল চমৎকার। যেমন ভাটিয়ালী, তেমন ঝুমুর, তেমনি শ্যামাসংগীত - আর বাংলা গজল গানের তো তুলনা নেই।

কাজীদার কাছে গানের ট্রেনিং নেওয়াটা ছিল খেলার মতো, রিহার্সালে বসে সুন্দর আবহাওয়াটা সৃষ্টি করতেন তিনি। গান করার পর প্রায়ই ঠাট্টা করে একটি কথা বলতেন কাজীদা। হয়তো একটি নতুন গান লিখে সুর বেঁধে শোনালেন। তারপরই তাঁর স্বভাবসুলভ প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি আমার মত করে গাইলাম। এবার নানী, তুমি আঙুরের রস মিশিয়ে বেশ মিষ্টি করে গাও দেখি।'

গ্রামোফোন কোম্পানির অনেকে আমাকে নানী বলে ডাকতেন। কাজীদাও আমাকে নাম ধরে না ডেকে ওই ডাকটাই বেছে নিয়েছিলেন। এই নানী ডাকটারও একটা কারণ ছিল। গ্রামোফোনের হিন্দী উর্দুগানের ট্রেনার ছিলেন ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ সাহেব। আমার চেহারা খাঁ সাহেবের মামীর সঙ্গে মিলতো বলে তিনি আমাকে মামী বলে ডাকতেন। আর তাঁর ছাত্ররা তাঁকে গুরু অর্থাৎ বাবার মতো দেখতো বলে সেই সুবাদে আমাকে বলতো নানী।

প্রত্যেক শুক্রবারে আমাদের গানের রিহার্সাল বন্ধ থাকতো। সেদিন কাজীদা আমার বাড়ি আসতেন। নানা রকম হাসি গল্প গানে মেতে উঠতো আমাদের বাড়ি। কাজীদার সেই পাহাড় কাঁপানো প্রাণখোলা হাসি ছিল মার্কা মারা। আমাদের পাড়ার সব লোক জেনে যেত যে, আমার বাড়িতে নজরুল ইসলাম এসেছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, কাজীদার ছেলে বুলবুল তখন ছোটো। সেও আসতো বাবার সঙ্গে।

বুলবুল মারা যাবার পর সেই সদা আনন্দময় কাজীদাকে চিৎকার করে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে দেখেছিলাম। কাজীদার সে ছবি আমি কোনোদিন ভুলবো না। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগনেল, 'নানী বুলবুল আমার চলে গেল।' এই কথা বলেন, আর শিশুর মতো প্রাণখোলা কান্নায় সকলের মন ভরিয়ে তোলেন কাজীদা। যেমন শিশুর মতোই হাসতে পারতেন। আমরা সে দিন কাজীদাকে নতুন করে দেখলাম যেন। এত হাসি খুশি মানুষ যে এতো প্রচুর কাঁদতেও পারেন, এযেন আমরা না দেখলে ভাবতেও পারতাম না। সেই কাজীদার প্রথম শোক পাওয়া। আর একটি এই রকম শোক পেয়েছিলেন বৌদি (শ্রদ্ধেয়া প্রমীলা নজরুল ইসলাম) অসুস্থ হওয়ার পর। .....

সহকর্মীদের শোকে দুঃখে বেদনায় কাজীদা সবসময়েই তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বড় দাদার মতো, বন্ধুর মতো, সখার মতো। নানা রকম গল্প বলে তিন আমাদের অবসর সময়গুলো ভরিয়ে দিতেন। শোনাতেন তাঁর জেলে থাকাকালীন কতো গল্প। আর শোনাতেন জেলখানার সেই সব বিখ্যাত গান, যা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে চিরকাল অমর করে রাখবে। বলতেন, 'জানো নানী, জেলে তো হাতে পায়ে

শিকল বাঁধা থাকতো, তা করতাম কি - এই ভাবে হাত দিয়ে পায়ের শিকল বাজিয়ে গান জুড়ে দিতাম, এই বলে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে সেই ভঙ্গীতে গান শুরু করে দিতেন ঃ

এই শিকলপরা ছল মোদের এ শিকলপরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধকারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয় করবো মোরা জয়
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকলভাঙা কল ॥

কী প্রাণবন্ত উদার কণ্ঠস্বর কাজীদার। তিনি গান গাইতেন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গেঃ

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকলপূজোর পাষাণদেবী।
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।

কাজীদার কণ্ঠে এইসব গান শুনে আমরা যেন এক অন্যজগতে গিয়ে পৌঁছুতাম। সেখানে থাকতো না কোন মান অভিমান, সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব। কাজীদা একমনে বসে শোনাতেন তাঁর জ্বালাময়ী গান আর কবিতা। আবার কখনো কখনো আমরা নিজেরাই ফরমাস করতাম'। 'কাজীদা আপনার সেই 'নারী' কবিতাটা একবার শোনান না। 'শুনবে?, আচ্ছা শোন'।' সেই মেঘ গুরু গুরু ভরাট কণ্ঠে কাজীদা আবৃতি করে শোনাতেন তাঁর নারী কবিতা। এমনি নিরহঙ্কারী মানুষ ছিলেন তিনি।

অনেক সময় আবার মুখে মুখে কবিতা বানিয়ে শোনাতেন। তখন যদি আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সে সব কবিতা টুকে রাখতো, তাহলে এখন কাজীদার কবিতা পাঠ করে অনেক কিছু জানতে পারতো তাঁর সম্বন্ধে।

একবার সেই বিষ্ণুভবনের রিহার্সাল রুমে বসেই কে যেন একদিন বললে, 'কাজীদা, এমন একটা চার লাইনের ছোট কবিতা বানানতো, যার শেষ লাইনের শেষে থাকবে 'এতো দুখে সুখ'। কাজীদা বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও' এই বলে এক মিনিট ভেবেছেন কি না ভেবেছেন, অমনি মুখে মুখে বানিয়ে বললেন ঃ

চখা-চখী ছিল এক বনের ভিতরে
নিষাদ আনিয়া তারে রাখিলেক ঘরে।

চখা বলে চখী ভাই, এ বড় কৌতুক
বিধি হতে ব্যাধ ভালো, এতো দুখে সুখ।

আমি বললাম, 'কাজীদা এর মানে কি হলো? উনি বললেন ঃ 'ভগবানের নিয়ম কি জানো? চখা আর চখী সারাদিন একই সঙ্গে থাকবে, কিন্তু রাত হলেই তারা একজন নদীর এপারে আর একজন ওপারে চলে যাবে। এক সঙ্গে তারা কখনোই থাকে না। তাই এখানে চখা বলছে চখীকে যে, আমাদের কাছে বিধির চেয়ে ব্যাধই ভালো। ভগবান আমাদের রাত হলে আলাদা করে রাখেন, আমাদের মিলন ঘটতে দেন না, কিন্তু ব্যাধ একরাতের জন্য হলেও দুজনকে এক সঙ্গে রেখেছে। কাল সকালেই হয়তো আমাদের মেরে ফেলবে, হয়তো দুজনকে দুজায়গায় বিক্রি করে দেবে, তবু সেই চিরকালের বিচ্ছেদ দুঃখের মধ্যেও আজ রাতে এই এক সঙ্গে থাকার আনন্দ আমরা পাচ্ছি। এতো দুঃখের মধ্যেও এই সুখের তুলনা হয় না।' মুখে মুখে এইরকম অনেক ছোট বড় কবিতা তৈরী করে শোনাতেন কাজীদা।

সময়ের দিকে তাঁর নজর থাকতো না। কথায় হাসিতে গল্পে গানে কবিতায় কোথা দিয়ে যে হু হু করে সময় কেটে যাচ্ছে, সে দিকে যেন খেয়ালই থাকতো না। তাবে শেষের দিকে বৌদি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হবার পর কাজীদা খুব সময় মেনে চলতেন। তখন শুধু হাসিগল্পের সময়ই নয়, খুব কাজের জরুরী রিহার্সালের সময়ও, কাজ চলতে চলতে সময় হলেই কাজীদা সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেন, বলতেন 'এবার তোমরা চালিয়ে যাও, আমাকে বাড়ি যেতে হবে। জানো তো, তোমাদের বৌদি একা শুয়ে আছে। .....বৌদি অসুস্থ হবার পর কাজীদা নিজের মনের মধ্যে সবসময়েই একটি বেদনা লুকিয়ে রাখতেন। এটা আমরা, যারা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি তারা ছাড়া আর কেউ বুঝতো না। ..... তাঁর অসুস্থ হবার পর থেকেই কাজীদার মন ঘরমুখী হয়ে পড়ে। সব সময়েই যেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে থাকতেন। তারপর একদিন তাঁর মধ্যেও শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এলো। .....

তবে আজ একটি কথা আমার মনে হয়, সেদিনের সেই কাজীদার কাছে গান শেখা ছিল দুর্লভ ভাগ্যের - যা আমার জীবনে ঘটেছে। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত অনেক গান রেকর্ড করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গান হলো ঃ ভুলি কেমনে আজো যে মনে, এত জল ও কাজল চোখে, নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল, চৈতী রাতের উদাসী হাওয়ায়, পিয়ালা কেন মিছে আনিলে ভরি, পূজোর থালায় আছে আমার, নিশি ভোর হলো জাগিয়া, গানগুলি মোর আহত পাখির সম, আমার বিফল পূজাঞ্জলি, তোমার বুকের ফুলদানীতে, কে দিল খোঁপায় ফুল। আমার গাওয়া কাজীদার এই গানগুলি সে যুগে, সেই তিরিশ দশকে লোকের মুখে মুখে ফিরতো। পুরনো দিনের সেইসব স্মৃতি মনে করে আজও আমার মন ভরে ওঠে।" (আঙুরবালা দেবী, 'কাজীদার গানের স্মৃতি, "নজরুল কথা," বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতা ঃ সাহিত্যম, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, পৃষ্ঠা (১৬৭-১৭৪)

স্মৃতিচারণে আঙুরবালা অন্যত্র উল্লেখ করেছেনঃ "গ্রামোফোন কোম্পানিতেই পরিচিত হলাম কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। কাজী নজরুল তাঁর মধুর ব্যবহারে আমাদের সবাইকে নিজের করে নিয়েছিলেন। আমরা সবাই যার জন্যে তাঁকে কাজীদা বলে ডাকতাম। কাজীদার গানের ভাষা, অপরূপ ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। প্রাণবন্ত ভাষার সঙ্গে মার্গসংগীতের ধারায় মেশা নজরুল গীতি হল আমার সাধনার জিনিস। নজরুল গীতির গায়িকা হিসেবে সার্থক হবার আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে গড়ে উঠলো। আজ নজরুল গীতির গায়িকা হিসেবে প্রশংসা করলে আমি গর্বিত বোধ করি।

কাজীদা আমাকে গানের ট্রেনিং দিতেন। কাজীদার কাছে তারই লেখা গান, তারই সুরে নিত্য নতুন করে শিখতাম। তাঁর গানের ভাষা ও সুর অত্যন্ত মধুর ও প্রাণবন্ত লাগতো। তাঁর কাছে গান শিখে যেমন আনন্দ, গেয়েও তৃপ্তি পেতাম। কাজীদা চাইতেন তাঁর গানের প্রতিটি কথা যেন আমরা তাঁরই মত উচ্চারণ করি। গানের মর্মার্থ পুরোপুরি বুঝে গান করি। একদিন কাজীদা আমাকে শেখাচ্ছিলেনঃ

এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বলে কে?

দিল কি পুব হাওয়াতে দোল
বুকে কি বিন্ধিল কেয়া

আমি ভাবলাম কাজীদা হয়তো তাঁর নিজের ভাষা অনুযায়ী বিন্ধিল বলছেন। গান গাইবার সময় আমি বিন্ধিল-র পরিবর্তে বিঁধিল বলছিলাম। ভাবছিলাম চলিত ভাষায় হয়তো মধুর শোনাবে। অনেকবার গাইবার পরও দেখলাম কাজীদা সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। পরে তিনি বললেন - আঙুর একবার বিন্ধিল বলতো। এবার কাজীদার কথা মতো বিন্ধিল বলেই গাইলাম। কাজীদা যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, এইতো ঠিক হয়েছে। আমিও যেন একটি মাত্র কথা উচ্চারণের মধ্যে নতুন এক ছন্দের মাধুর্য অনুভব করলাম।

আমি ছাড়াও কাজীদার কাছে ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া ও আরো অনেকে গান শিখতেন। ঝরিয়ায় থাকতো বলে বাঙালী হয়েও কমলা পরিচিত হয়ে গেল কমলা ঝরিয়া নামে। আমাদের প্রত্যকের জন্য গান শেখার নির্দিষ্ট সময় ছিল। কাজীদার যত ঠুংরী গান তার বেশির ভাগ আমাকে শিখিয়েছেন। ভৈরবী গাইতে আমার খুব ভাল লাগে, প্রাণ ঢেলে গাইতে পারি। ভৈরবী আমার প্রিয় সুর। কাজীদা ঠুংরি গজলই বেশি শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে শেখা 'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই' ঠুংরী। ভীমপলশ্রী সুরে গানটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত অনুষ্ঠানে আমি গেয়েছি বেশির ভাগ অনুষ্ঠানে এই গানটি গাইবার অনুরোধ এসেছে।....

সুরের ওপর কাজীদার কি অসাধারণ দখল ছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর শেখাবার ধরন ছিল এরকম - -- প্রথমে একটা গান দিলেন, আমার গলায় শুনলেন।

গলায় সুর কি রকম উঠেছে দেখে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করলেন। অনেক সময় কথাও বদলাতেন। খুব ভাল গাইলে বলতেন তোমার কণ্ঠে আমার গান প্রাণ পেলো। কোন কোন সময় ঠাট্টা করে বলতেন, আমি তো কাঠামোটা তুলে দিলাম এবার তুমি আঙুরের রস মিশিয়ে মিষ্টি কর। তাঁর কাছে শেখা প্রথম গানঃ ভুলি কেমনে আজো যে মনে। তারপরে গজল, ঠুংরী, ভজন, ঝুমুর, ভাটিয়ালী, স্তোত্র মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটির মত নজরুগীতি আমি রেকর্ড করেছি। প্রথম নজরুলগীতি আমি রেকর্ড করেছিঃ ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা এবং এত জল ও কাজল চোখে। এই গান দুটিতে কাজীদাই সুর দিয়েছেন। যেসব নজরুগীতি আমি গেয়েছি প্রত্যেকটি গানই আমার খুব প্রিয়। যেমন - যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারি নাই, গোধুলীর রঙ ছড়ালো কেগো আমার সাঁঝ গগনে, পূজার থালায় আছে আমার ব্যাথার শতদল, সে চলে গেছে বলে কি গো তার স্মৃতি যায় ভোলা, চৈতী রাতে উদাস হাওয়ায় পরাণ আমার কাঁদে গো, ঐ ঘর ভোলানো সুরে, বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ প্রভৃতি।" (নজরুল গীতি অন্বেষা, কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭, পৃষ্ঠা ৯৯-১০১)

ইন্দুবালা ঃ

আঙুরবালার মতোই নজরুলের গানের প্রতিনিধিস্থানীয় গায়িকা ও নজরুলশিষ্যা ইন্দুবালা। স্মৃতিচারণে তিনি জানিয়েছেনঃ "জীবনে আমাকে বহুবার বহু জায়গায় অটোগ্রাফ দিতে হয়েছে। সকলকে আমি একটিই গানের লাইন লিখে দিই- 'অঞ্জলি লহো মোর সংগীতে।' এটি আমার একটি খুব প্রিয় গানের প্রথম ছত্র। এ গান আমাদের প্রিয় কাজীদা, কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। আর কাজীদার তৈরী অপূর্ব সুরে এ গান আমি গেয়েছি রেকর্ডে। এই গানটির কথা উঠলে আজো আমার মনে পড়ে যায় পুরনো দিনের কতো স্মৃতি। কাজীদার কতো কথা। মনে মনে ভাবি আমাদের সেই আনন্দময়, সদা হাস্যময় কাজীদার কতো ছোটো ছোটো ঘটনা। তাঁর ঘরোয়া সহজ সরল গল্প, হাসিঠাট্টা, আর সেই মনমাতানো গান। যার তুলনা আমার এই দীর্ঘজীবনে আর কোথাও কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি।

চিৎপুরের বিষ্ণুভবনে ছিল আমাদের গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল ঘর। কাজীদা ছিলেন আমাদের বাংলা গানের ট্রেনার। কাজীদার রিহার্সাল ঘরে সদা সর্বদাই থাকতো নানা লোকের ভীড়। কাজের লোকই শুধু নয়, নানান অকাজের লোকও এসে ভীড় জমাতো। তা এজন্যে তাঁকে কোনোদিন বিরক্ত হতে বা কারুকে চড়া গালায় কথা বলতে শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। একদিন তাঁর ঘরে লোকজনের ভীড় ছিল কম। কাজীদা তাঁর প্রিয় পান আর জর্দার কৌটো নিয়ে বসেছিলেন। মুখে একমুখ পান, সামনে খোলা গানের খাতা। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর তাঁর নিজস্ব কায়দায় হা হা করে হেসে উঠলেন। এমন হাসি - যা আমার মনে হয়েছে

কাজীদা ছাড়া আর কেউ হাসতে পারবেন না কোনোদিন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আয় ইন্দু বোস বোস।' তারপর আমি তাঁর পাশটিতে বসতেই বললেন, 'আচ্ছা অঞ্জলি লহো সংগীতে' এর উল্টো পিঠের গানটা কি লিখি বলতো?' আমি চট করে কোনো জবাব দিলাম না। কাজীদা মহান কবি, শ্রেষ্ঠ গীতিকার, তাঁর একথার জবাব দিতে যাওয়া আমার মতো মানুষের পক্ষে মুর্খামী ছাড়া আর কি? তাই একটুখানি চুপ করে থেকে শুধু বললাম, 'কাজীদা এই গানের সঙ্গে ঐ গানটাও যেন খুব ভাল হয়।'

কাজীদা আবার হা হা করে হাসিতে সারা ঘর ভরিয়ে তুলে বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়া, চুপটি করে বোস।' বলে মুখে একমুখ পান ঠেসে দিয়ে খস খস করে কাগজে লিখে দিলেন সেই আমার গাওয়া বিখ্যাত গানটি- 'দোলা লাগলো দখিনার বনে বনে।'

কাজীদা এতো বড় ছিলেন, এতো মহান ছিলেন, তবু তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে বন্ধুর মতো আলোচনা করতেন। এমন কি যে গানের জন্য তাঁর এতো খ্যাতি, এতো দেশজোড়া নাম, সেই গানের বাণী তৈরির সময়েও তিনি জিজ্ঞেস করতেন আমাদের মতামত।

কাজীদার একটি জিনিস দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই হতো। রিহার্সাল ঘরে খুব হৈ-হুল্লোড় চলছে, নানা জনে করছে নানা রকম আলোচনা। কাজীদাও সকলের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করছিলেন, হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একধারে সরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন খানিক। অনেকে তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্যই করলো না হয়তো। কাজীদার সেদিকে খেয়াল নেই। এতো গোলমালের মধ্যেও তিনি একটুক্ষণ ভেবে নিয়েই কাগজ-কলম টেনে নিলেন। তারপর খসখস করে লিখে চললেন আপনমনে। মাত্র আধঘন্টা, কি তারও কম সময়ের মধ্যে পাঁচ-ছ'খানি গান লিখে পাঁচ ছ'জনের হাতে হাতে বিলি করে দিলেন। যেন মাথার মধ্যে গানগুলি তাঁর সাজানোই ছিল, কাগজ কলম নিয়ে সে গুলো লিখে ফেলতেই যা দেরী। কাজীদা এই রকম ভীড়ের মধ্যে, আর অল্প সময়ের মধ্যে গান লিখতে পারতেন। আর শুধু কি এই? সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে সেই পাঁচ-ছ'জনকে পরপর সেই গান শিখিয়ে দিয়ে তবে রেহাই দিতেন তিনি। গান লেখার সঙ্গে সঙ্গে সুরও তৈরী করে ফেলতেন কাজীদা। অপূর্ব সব সুর, যার তুলনা হয় না।

বিষ্ণুভবনের তিন তলায় হতো কাজীদার বাংলাগানের রিহার্সাল। আর হিন্দী উর্দুগানের রিহার্সাল হতো দু'তলায়। সেখানে গান শেখাতেন ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ সাহেব। তা এক-একদিন এমনও দেখেছি যে, ওস্তাদজী তাঁর দু'তলার ঘরে তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে একা একা বসে আছেন - আর যাদের হিন্দী গান শেখার কথা তারা এসে কাজীদাকে ঘিরে বসে কাজীদারই গান গাইছে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে। আর খাঁ সাহেব সিঁড়ির মুখে উঠে এসে অবাক হয়ে বলছেন, ও, তাইতো বলি, এখানে কাজীর আসর বসেছে? তবে আর আমার কাছে কে যাবে দোতলায়।'

এমনি ছিলেন কাজীদা সকলের প্রিয়। কাজীদার কাছে আবদার করে কেউ কোনোদিন বিমুখ হয়নি। এই আমার কথাই বলি। একদিন তাঁকে বললাম, 'কাজীদা আমাকে একটা খুব ভালো গান লিখে দিবেন? খুব দরদ দিয়ে গাইবো।' কাজীদা তাঁর হাসি মাখানো বড়ো বড়ো দুটি চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'খুব ভালো গান?' বললাম, হ্যাঁ। 'আচ্ছা বোস চুপ করে'। বলে কাজীদা একটুরো কাগজ টেনে নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন কি ভাবলেন না, অমনি লিখে চললেন খস খস করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিখে দিলেন - 'তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হয়ে রবো আমি' গানটি। তক্ষণি সুরও তৈরী করে দিলেন। গানটি এতো চমৎকার হয়েছিল যে আঙুর সেটি কেড়ে নিলে। তারপর সে গান আঙুরবালা রেকর্ড করেছিল। খুব ভালো গেয়েছিল সে।

কাজীদার গান শেখাবার রীতিনীতি ছিল অদ্ভুত। কোনো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে কোনোদিনই তিনি চলতে পারতেন না। এক এক দিন রিহার্সালে গিয়ে দেখতাম কাজীদার এক এক রকম রূপ। আজ হয়তো গিয়ে দেখলাম শেখাচ্ছেন রাগপ্রধান। কাল গিয়ে দেখি ঠুংরী। তার পরের দিন গজল। আবার তার পরের দিন গিয়ে দেখি একেবারে অন্য জিনিস, ভাটিয়ালী। ভাটিয়ালীর পরেরদিন পাতলেন শ্যামাসংগীতের আসর। আবার তার পরের দিন চললো একটার পর একটা বাউল গান। এই গানেরই কি শেষ। বাউলের পরের দিন গিয়ে দেখি, ওমা- যতো রাজ্যের কমিক গান গাইয়েদের জুটিয়ে এনেছেন কাজীদা। হরিদাস বাড়ুজ্জে, রঞ্জিত রায়- এঁরা সব কাজীদাকে ঘিরে বসে আছেন আসর জাঁকিয়ে। আর কাজীদা? তিনি তখন হাসির গান রচনায় ব্যস্ত কোনোদিকে তাঁর খেয়াল নেই। পৃথিবী রসাতলে যাক আর থাকুক-তাতে যে কিছুই তাঁর আসবে যাবে না-এমনি ভাবখানা। হারমোনিয়াম বাগিয়ে ধরে উদাত্ত ভরাট গলায় কাজীদা গেয়ে চলেছেন - কলগাড়ীটা ভঁসোর ভাঁসোর - হাওয়া গাড়ী খুচুর খুচ্। সে কী বিরাট হাসির তরঙ্গ। রাস্তার মানুষও আওয়াজ শুনে ওপর দিকে তাকাতো অবাক হয়ে। তাপর বদনা গাড়ু আর কেটলী নিয়ে এমন হাসির গান জুড়লেন কাজীদা যে হু হু করে সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা আমরা বুঝতেও পারলাম না। এইখাইে শেষ নয়। এই দম-ফাটনো হাসির গানের পরের দিনই রিহার্সালে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই হয়তো বুঝতে পারি, কাজীদা আজ শ্যামা সংগীতের আসর বসিয়েছেন। বলা যায় না, আগামীকাল হয়তো এসে দেখবো আসর বসেছে মধুর কীর্তনের।

একের মধ্যে এতো বিরাট ব্যাপার, আমার মতো সামান্যা তার কিছুই বলতে পারবে না ভাষায়। সেসব স্মৃতি মনে করতেও আজ আমার বুকে ব্যথা বাজছে। আমার অন্তরে শুধু জেগে আছে তাঁর আনন্দময় বিরাট বুকভারা হাসি। আর পানজর্দা, যা আমরা দিন রাত ধরতাম তাঁর মুখের কাছে। কাজীদার সময়ে কী শান্তিময় ছিল সেদিনের বিষ্ণুভবন, আজ আজকের নলিনী সরকার স্ট্রীটের রিহার্সাল রুমের কথা মনে করলেই ভয় হয়।

তখনকার কালে কাজীদার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের জ্ঞান আমরাও ফেলতাম হারিয়ে। সকাল দশটায় রিহার্সালে হাজির হয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেতো। সারাদিন ভাত খেয়েছি কি না খেয়েছি মনেও থাকতো না কারুর। কেবল তেলেভাজা মুড়ি খেয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতাম আমরা আনায়াসে। এমনি, কতো ঘটনা ঘটে গেছে তখনকার দিনে।" (ইন্দুবালা দেবী, 'আনন্দময় কাজীদা,' "নজরুল কথা" বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতাঃ সাহিত্যম, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮৩)

স্মৃতিচারনের অন্যত্র ইন্দুবালা বলেছেন ঃ 'কিছুদিন পরেই আমি কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাই। বল বাহুল্য আমার গানের জীবনের ক্ষেত্রে এই পরিচয় একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেন না, সেসময় বাংলা গানের ক্ষেত্রে কাজীদাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু ভাবা অসম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান যা তখন রবিবাবুর গান বলে পরিচিত তা সাধারণ মানুষের কাছে আজকের মত এত বেশি প্রচারিত ছিল না। প্রথমে কাজীদা গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদান করেছিলেন ওস্তাদ জমীরউদ্দিন খাঁ'র সহকারি হিসেবে। সেকালের সেরা ঠুংরি গায়ক পাঞ্জাবের কাছে কাজীদা ঠুংরীর তালিম নিতেন। হেড কম্পোজার ও ট্রেনার হিসেবে কাজীদা প্রমোশন পেয়েছিলেন জমীরউদ্দিন খাঁর মৃত্যুর পর। ফলে গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমাদের গান তোলা ও রেকর্ড করার ব্যাপারে কাজীদার কাছেই যেতে হতো।

.... কাজীদা আসার পর বাংলা গান নিয়ে আবার মেতে উঠলাম। বাংলা গানের ব্যাপারে যাঁরা আমার সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধাস্পদ কাজীদা ও ধীরেন দাস তাঁদের অন্যতম। রেকর্ডে সে সময় বাংলা গান গেয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলাম তার নেপথ্যে এঁদের অবদানই ছিল সর্বাধিক।

কাজীদার অনেক গান আমি তখন থেকে গেয়েছি। সেগুলো জনপ্রিয় হবার মূলে ছিল কাজীদার গানের ভাব, ভাষা ও সুরের মাধুর্য। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর মত সুদক্ষ সুর শিল্পী আমি কমই দেখেছি। তিনি আমার মতে সমসমায়িক প্রত্যেক গীতিশিল্পীর শ্রদ্ধার যোগ্য। এত প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, আবেগপ্রিয় মানুষ গানের জগতে আমি আজো দেখিনি। আর এক জনের নৈপুণ্যের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি আমার দেশের সেকালের বিখ্যাত গায়ক ধীরেন দাস। তাঁর ছেলে অনুপকুমার বহুদিন ধরে সিনেমায় অভিনয় করে চলেছেন। নজরুলের গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠার কৌশল আমি প্রধানত তাঁর কাছেই শিখেছি। গানের যে সজীবতার লক্ষণ বা স্পন্দন এবং ভাবের অভিব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় তা তিনি মেনে চলতেন। আমার অনেক বাংলা গানের সুর তাঁর পরিকল্পনার অনুসারেই রচিত।

কাজীদার কাছে শেখা গান প্রথম রেকর্ড করি 'রুমু ঝুম রুমু ঝুম', অপরপিঠে ছিল 'চেয়োনা সুনয়না আর' (রেকর্ড নং পি ১১৬৬১)। কাজীদার লেখা সেই গানে সুরও দিয়েছিলেন স্বয়ং কাজীদা। কিন্তু ডিরেকশন ছিল ধীরেন দাসের। সেই সময় আমার

মতই অন্যান্য যারা কাজীদার গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন তারা হলেন আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়া, হরিমতী, মানিকমালা, মিস লাইট, ধীরেন দাস প্রমুখ। এর মধ্যে আমি আর আঙুর কাজীদার গান বেশী গেয়েছি বলে মনে পড়ছে। হরিমতীর গাওয়া 'ঝরা ফুল দলে' গানটি এখনো কানে বাজে। চমৎকার গেয়েছিলেন হরিমতী ঐ গানটি। মিস লাইটের অবশ্য একটি মাত্র কাজীদার গানের রেকর্ড ছিল। কিন্তু তাতেই সে খুব সুনাম অর্জন করেছিল। আমি কাজীদার পঞ্চাশটির মত গান রেকর্ডে গেয়েছিলাম বলে আমার মনে পড়ছে। অর্থাৎ মোটে ২৫টি রেকর্ডে আমি কাজীদার গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অবশ্য সেই সময় ফিল্মের গান, নাটকের গান, ফিল্মের অভিনয় কলকাতার স্টেজে অভিনয় প্রভৃতি কাজেই বেশী জড়িয়ে পড়েছিলাম। তবু তারি মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে কাজীদার গান রেকর্ড করার ও গাইবার লোভ ছাড়তে পারিনি। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ভাষায় আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর গান গেয়েছি, রেকর্ড করেছি, মেহফিল-এ অংশ নিয়েছি। তবু কেন জানি না কাজীদার গানই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ ও জনপ্রিয়তা দান করেছে। সেকালে সমজদার লোকেরা আমাকে সংগীত সম্রাজ্ঞী বলে সম্মান দিয়েছেন। কমলা ঝরিয়া ছিলেন সেকালের নজরুলের গানের রানী। তার গাওয়া 'প্রিয় যেন প্রেম করোনা এ মিনতি করি' গানটির সত্যি তুলনা হয় না। আর আঙুরতো নজরুলের গানের সম্রাজ্ঞী। এর প্রমাণ সে আজো দিয়ে চলেছে।

কাজীদার গানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমার সবচেয়ে ভালো লাগত তা হলো গানে ঠুংরীর ঢঙ আর লয়দারী। হিন্দী গানের ভাঙা সুরও চমৎকারভাবে গানে জুড়ে দিতেন কাজীদা। এছাড়া গজলের মতো শায়র ঢঙে সুর রচনা করে তিনি গায়ক ও শ্রোতাকে মাতিয়ে তুলতেন। ফলে আমরা যারা খেয়াল ও ঠুংরী গানের জগৎ থেকে বাংলা গানের আসরে এসেছিলাম তারা কাজীদার গানের মধ্যে বেশ রগর আর সুরের মজা পেয়ে গেলাম। কাজীদার গানের মতো এত বৈচিত্র্য আমরা অন্য কারো বাংলা গানে পেতাম না। তাঁর কাছে আমি অনেক ভজন জাতীয় গানও শিখেছিলাম। একটা গানের কথা খুব মনে পড়ে। গানটা ছিল 'হে বিধাতা' অপর পিঠে 'ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরায়, দ্বার ছেড়ে দাও দ্বারী'। এ ছাড়া কাজীদার হোলির গান গেয়েও খুব তৃপ্তি পেয়েছি। 'আজি নন্দ দুলালের সাথে' বা 'আয় গোপিনী খেলবি হোলি' রেকর্ডে গেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। বেনারসওয়ালীরা শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কাজরী গাইতেন। তাঁদের গানের ঢঙে কাজীদাও তখন 'কাজরী' গান লিখেছিলেন। 'কাজরী গাহিয়া চল গোপ ললনা' গানটি ওই ছাঁদে কাজীদা আমায় শিখিয়ে রেকর্ড করান।

আজকাল অবশ্য অনেক শিল্পী কাজীদার গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। নতুনদের মধ্যে হরিহর শুক্লার কন্যা হৈমন্তীর গান আমার খুব ভাল লাগে। অপূর্ব গায় হৈমন্তী। ও ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরো ভালো গাইবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রথিতযশা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বেশি করে কাজীদার গান গাইলে ভালো হতো। ওর গলা ভালো,

কাজও আছে গলায়। কিন্তু ও বেশি গায় না কাজীদার গান। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও গলা ভালো, গায়কী ভালো। কিন্তু রেকর্ডের গানে অত বেশি কারুকাজ বিস্তার লয় ইত্যাদি যোগ করার ব্যাপারটা অনেকের মতো আমারও ভালো লাগেনা। ওতে কাজীদার গানের ঠিক স্বাদটি না পাবারই সম্ভাবনা। ফিরোজা বেগমের গলাটি খুব ভালো, গায় চমৎকার। ওর স্বামী কমল দা (কমল দাশগুপ্ত) কাজীদার সব গান জনতেন। কমলদা কাজীদার সব গানের নোটেশন নিতেন। সেসব ফিরোজাকে চমৎকার শিখিয়ে গিয়েছেন কমলদা। ফিরোজা তার সে শিক্ষার যথার্থ ব্যবহার করছে।

প্রসঙ্গত অনুপ ঘোষালের কথা মনে পড়ছে। ওরও গলা বেশ সুরেলা, গায়ও চমৎকার। কিন্তু অনুপ দুটি গান গেয়েছে নজরুল গীতি বলে, সে গান দুটি আসলে কাজীদার লেখাই নয়। আমি গান দুটি সেকালে অনেক গেয়েছি। গান দুটি ধীরেন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন। গান দুটির প্রথম লাইনঃ 'সখি দেখে আয় বধূ এল কি দুয়ারে' এবং কত রাতি পোহায় বিফলে হায় জাগি জাগি।' আঙুরের সঙ্গেও এব্যাপারে কিছুকাল আগে আমার কথা হয়েছিল। ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় বেশ উঁচুদরের গাইয়ে। বিশেষ করে 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' চমৎকার গেয়েছে অঞ্জলি।

এছাড়া পুরনো দিনের যাঁরা কাজীদার গান আজো গাইছেন তাঁদের মধ্যে এখনো আঙুরের গানেই কাজীদার গানের সঠিক মেজাজ ও ঢঙ সবচেয়ে বেশি বর্তমান। ওর 'আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়' গানটি কি তুলনা আছে? এছাড়া সুপ্রভা সরকারের কথা মনে পড়ে। মহা ভালো গাইয়ে সে। যেন কাজীদার গান গুলে খেয়েছে। সম্ভবত আজকাল কাজীদার গানের ও এক নম্বর গাইয়ে।

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এখনো কাজীদার গান বেশ ভালো গাইছেন। কমলা ঝরিয়ার কথাতো আগেই বলেছি। গানের কথা বলতে গিয়ে আর একজনের কথা মনে আসে। তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় রামকুমার চট্টোপধ্যায়। সকল রকম গানের রাজা তিনি। এখন বাংলায় তাঁর মতো সব রকমের গান জানা ব্যক্তি এখন আর কে আছেন? ওর গান সম্বন্ধে আমি আর কতটুকু বলতে পারি?

এখনকার নজরুলগীতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। কাজীদার গান তখন যে রসটি গায়ক গায়িকারা এবং শ্রোতারা পেতেন এখন তার অভাবটা কেন জানি খুবই অনুভব করি। সুরের বিচ্যুতি আজকাল হামেশাই ঘটছে। ফিরোজার গানে তবু কাজীদাকে অনেকটা ফিরে পাই। তাই তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু নতুনদের মধ্যে সুরের বিচ্যুতি বড় বেশি। এভাবে বেশীদিন চললে মুল রসের পথ থেকে কাজীদার গান অচিরেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। পুরনো দিনের অভিজ্ঞ ও ভালো গাইয়েরা যদি একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করে আসল সুরগুলো সংগ্রহ করেন এবং তার ধারাবাহিক স্বরলিপি প্রস্তুত করেন তাহলে খুব ভালো হয়। কেননা, ভবিষ্যতে কাজীদার গানের সুর ও ঘরানার বিশুদ্ধতা তাতেই হয়তো আনেকখানি রক্ষিত হবে। এ বিষয়ে সরকার এবং

অন্যান্য সংগীত প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস।" (নজরুল গীতি অন্বেষা, কল্পতরু সেনগুপ্ত, সম্পাদিত, কলকাতা ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮)

জসীমউদ্দিন ঃ

কবি জসীমউদ্দিন নজরুলের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এখানে কবি জসীমউদ্দিন তাঁর স্মৃতিকথায় বলেনঃ "এই লোকটি আশ্চর্য লোকরঞ্জনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই যেখানে গিয়াছেন যশ-সম্মান আপনা হইতেই আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে আজ যে এতো কথাকার আর সুরকার গুঞ্জরণ করিতেছেন, এ শুধু নজরুলের জন্যই। নজরুল প্রমাণ করিলেন যে গানের রেকর্ড বেশী বিক্রী হয় -সে শুধু গায়কের সুকণ্ঠের জন্যেই নয়, সুন্দর রচনার সহিত সুন্দর সুরের সমাবেশ রেকর্ড বিক্রয় বাড়াইয়া দেয়। আমি দেখিয়াছি গ্রামোফোন কোম্পানিতে নানান ধরনের গানের হট্টগোলের মধ্যে কবি বসিয়া আছেন-সামনে হারমোনিয়াম-পাশে আনেকগুলি পান আর গরম চা। ছ'সাতজন নামকরা গায়ক বসিয়া আছেন কবির রচনার প্রতীক্ষায়- একজনের চাই শ্যামসংগীত, অপরজনের কীর্তন, একজনের ইসলামী সংগীত, অন্যজনের ভাটিয়ালী গান- আরেক জনের চাই আধুনিক প্রেমের গান। এঁরা যেন অঞ্জলি পাতিয়া বসিয়া আছেন। কবি তাঁহার মানসলোক হইতে সুধা আহরণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের করপুট ভরিয়া দিবেন। কবি ধীরে ধীরে হারমোনিয়াম বাজাইতেছেন, আর গুন গুন করিয়া গানের কথাগুলি গাহিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে থামিয়া কথাগুলি লিখিয়া লইতেছেন। এইভাবে একই অধিবেশনের সাত আটটি গান শুধু রচিত হইতেছে না তাহার সুর সংযোজিত হইয়া উপযুক্ত শিষ্যের কণ্ঠে গিয়াও আশ্রয় লইতেছে।" (জসিমউদ্দিন, কবি নজরুল প্রসঙ্গে, "নজরুল স্মৃতি," বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতাঃ সাহিত্যম, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫)

প্রণব রায় ঃ

নজরুলের সমকালে তাঁর স্নেহধন্য আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা প্রণব রায় স্মৃতিচারণে বলেনঃ 'কাজীদা ছিলেন একেবারে সাত্যিকার স্বাভাবকবি। কাগজকলম নিয়ে বসলেই হলো। যেন একেবারে কল খুলে দেওয়ার মত হুড় হুড় করে কলমের ডগা দিয়ে কাব্য, রচনা ইত্যাদি বেরিয়ে আসত। একবার দেখেছিলাম গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুমে ২৭ মিনিটের মধ্যে পাচ-ছ'খানা শ্যামাসংগীত তিনি লিখে ফেললেন এবং প্রত্যেকটাই অনবদ্য। তার মধ্যে ২/১ টা গানের প্রথম লাইন আমার মনে আছে -- 'আমার মানস বনে ফুটেছে রে শ্যামালতার মঞ্জরী, বা 'শ্যামা নামের লাগল আগুন'। কত তাড়াতাড়ি কাজীদা লিখতে পারেন সেটা দেখবার জন্য আমি ঘড়িটা দেখেছিলাম। কমল দাশগুপ্তের সুরের ওপর কাজীদার খুবই একটা

ভাল ধারণা শুধু বলব না, কমলের সুরকে কাজীদা আদর করতেন। সেই জন্য অনেক ভাল ভাল গান লিখে কমলকে দিতেন। তার মধ্যে মনে আছে যুথিকা রায়ের রেকর্ড করা গান 'তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম'। আরো অনেক রকম গান কাজী সাহেব লিখেছিলেন। হাসির গানেও যে তাঁর জোড়া কেউ ছিলেন না সেটাও প্রমাণ হয়ে গেছে। তখনকার কালের যিনি মস্ত কমেডিয়ান রঞ্জিৎ রায়, তাঁর রেকর্ডে কাজীদার লেখা হাসির গান রঞ্জিৎ বাবু অনেক রেকর্ড করেছেন এবং সেগুলো তখন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তখন সেসময় Down Argentine way বলে একটি ছবি হয়েছিল কারমান মিরান্ডার। তাতে কারমান মিরান্ডার একটা গান ছিল চিকা চিকা বোম চিক। সেটা শুনে এসে কাজীদা লিখলেন চাম চিকা চাম চিকা চাম চিকা। সেও একটা অনবাদ্য গান হয়েছিল। তাছাড়া আরও বিদেশী সুর নিয়ে তিনি অনেক নতুন ধরনের গান করেছিলেন। যেমন South sea বা দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসিনীদের উদ্দেশ্য করে 'দুর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি,' বা মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' এই সব গান। অবশ্য বিদেশী রেকর্ড তিনি শুনেছিলেন কিন্তু সেই সুরের ওপর তিনি তাঁর অনবদ্য কথা বসিয়ে একটা নতুন ধরনের গান বাংলা গানের জগতে দিয়েছিলেন। আমার বা কমলের তখনকার বন্ধু ছিলেন সব বাজিয়ের দল অর্থাৎ রাজেন সরকার, টোপা দত্ত ওরফে অমর দত্ত। এরা সবাই ছিলেন গ্রামোফোনের বাজিয়ে। আমাদের এই দলটার সঙ্গে কাজীদার খুবই দহরম মহরম ছিল সে সময়। কিন্তু কাজীদার বয়স যত বাড়তে লাগলো একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম যে, কাজীদার ভেতরে কোথায় একটা অন্যজগতের ছোঁয়া বা ডাক এসে গেছে। অন্য উপলব্ধি এসে গেছে। যে কারণে তিনি অপূর্ব শ্যামাসংগীত লিখতেন, যে কারণে তিনি রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে অপূর্ব গান রচনা করতেন। একদিনের ঘটনা মনে আছে। সেদিনটা ছিল দোলের দিন। আমি, কমলদাশগুপ্ত, রাজেন সরকার একত্র হয়ে দোলের দিন হৈ হৈ করতাম। আবীর মেখে একটা গাড়ী ভাড়া করে কলকাতার বাইরে খানিকটা ঘুরে আসতাম। সেই রকম এক দোলের দিন আমরা রিহার্সালরুমে গিয়ে দেখি সেদিনও কাজীদা এসেছেন। সাধারণত ঐ দিনটি গ্রামোফোন কোম্পানি বন্ধ থাকে। তা কাজীদা দেখি নিজের ঘরে বসে খাতা নিয়ে একমনে গান রচনায় ব্যস্ত। আমরা গিয়ে বললাম, 'কাজীদা আজতো দোল, রঙ দেবো আপনাকে।' কাজীদা খাতাপত্তর গুছিয়ে রেখে একটু সরে বসে বললেন- 'দে'। কাজীদার মাথায় তখন বেশ একটু টাক হয়েছে। আমরা বেশ করে তাঁর মাথায়, মুখে, টাকে আবীর মাখলাম। একের পর এক যখন আমরা আবীর মাখিয়ে যাচ্ছি, কাজীদা মুখটা একটু নিচু করে বসে বসে দুলছেন। হঠাৎ আমি শুনলাম দুলছেন আর অস্ফুট স্বরে নিজের মনেই বলছেনঃ মধু বৃন্দাবন, মধু বৃন্দাবন। লক্ষ্য করে দেখি তাঁর দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। আমাদের এই রঙ দেওয়া উপলক্ষ্য করে সেই বৃন্দাবনের দোললীলা হয়তো তাঁর মনকে সত্যিই দুলিয়েছিল। তা নইলে চোখ দিয়ে তাঁর ওরকমভাবে জল পড়বে কেন? এই ঘটনাটি আমার আজো মনে আছে, হয়তো জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আর সেই দিন আর একটা কথা

উপলব্ধি করেছিলুম যে কবির কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই, কবির কোন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো দেশ নেই। কবি হচ্ছে মানুষ এবং সত্যিকারের প্রেমিক।

..... কাজী সাহেব বাংলা গজল লেখার জন্য কিছু গজলের মুখড়া পেয়েছিলেন এক ওস্তাদের কাছে থেকে। তাঁর নাম মঞ্জু সাহেব। সেই মঞ্জু সাহেব তখন এসেছিলেন বিখ্যাত কীর্তন গায়িকা রাধারাণীকে ঠুমরী শেখাবার জন্য। এই মঞ্জু সাহেবের সঙ্গে কাজীদার খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। তখন মঞ্জু সাহেবকে নিয়ে প্রায়ই কাজীদার বাড়ীতে বা রাধারাণী দেবীর বাড়ীতে গানের আসর বসতো। সেখানে বিবিধ গজলের মুখ, ঠুমরির মুখ কাজী সাহেব শুনতেন এবং সেই মুখড়া অবলম্বন করে বাংলায় প্রচুর গজল লিখতে শুরু করেন। .... কাজীদার বাংলা গজল বাংলা গানের জগতে একটা অভিনব জিনিস হয়ে দাঁড়াল। আর বাংলা গানে জগতে একটা নতুন দিক খুলে দিল। কাজীদার বাংলা গজল গানের প্রথম প্রচার করেছিলেন যিনি, আজকে তিনি অন্য মার্গের একজন সাধক বলে পরিচিত। তখন তিনি সদ্য বিদেশ থেকে মিউজিক সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা, আনেক শিক্ষালাভও করে সবে দেশে ফিরেছেন। তিনি হলেন স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায়। দিলীপকুমার রায় মহাশয়ই সর্বপ্রথম কাজী সাহেবের গান বিবিধ জলসায় গেয়ে গেয়ে প্রচার করে বেড়াতেন এবং দিলীপকুমারের বহু সুকণ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্রমশ গজল গাইতে শুরু করলেন। আমি নিজে এমনি বহু জলসা শুনেছি। সে জলসাগুলি হত রামমোহন লাইব্রেরী হলে।

.... কাজী সাহেবের সঙ্গে যখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে দেখা হলো এবং আমিও যখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে একজন গীতিকার হয়ে সেখানে কাজ শুরু করেছিলাম, সেই সময় কাজীদার কাছে থেকে যে স্নেহ ও উৎসাহ পেয়েছি তা ভোলবার নয়,। ..... ১৯৩৪ সালে আমার প্রথম রেকর্ড বেরোয়, তারপর থেকে প্রত্যেক মাসেই আমার রেকর্ড বেরোতে থাকে। প্রথম যখন আমার রেকর্ড বেরোয় গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে, যে মাসিক পুস্তিকা বেরোত, সে পুস্তিকার মধ্যে কাজী সাহেব নিজে আমার গান রচনা সম্পর্কে লিখেছিলেন যথেষ্ট প্রশংসা করে। সেটাও আমি ভুলতে পারবো না কোনদিন। তারপর দেখেছি কাজী সাহেবের কাজ। কি অজস্রভাবে ও কি অবলীলাক্রমেই তাঁর হাত দিয়ে অনবদ্য সব কাজ বেরোত। .... দীপালী নাগ গানের জগতে একটি পরিচিত নাম। আগ্রা থেকে কলকাতায় এলেন গ্রামোফোন রেকর্ড করতে। তিনি ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছ থেকে তালিম নিয়েছেন। তাই তাঁর জন্য একটি রাগপ্রধান গানের মুখ নিয়ে কাজী সাহেব লিখলেন 'মেঘ মেদুর বরষায়'। দীপালী সেটি রেকর্ড করেন এবং প্রথম রেকর্ডেই যথেষ্ট নাম করেছিলেন। আমি আগেও বলেছি যে এত বিভিন্ন ধরনের গান আর কোনো গীতিকার রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। কাজীদার আধুনিক গান বা বিদেশী সুরের গান ছাড়াও পল্লীগীতি ধরনের গান খুবই অসাধারণ। যেমন কুমার শচীন দেববর্মনের গাওয়া 'চোখ গেল চোখ গেল' বা 'পদ্মার ঢেউরে'। এছাড়াও সাঁওতালি ঝুমুর ধরনের সুরে অনেকগুলি আশ্চর্য সুন্দর গান রচনা করেছিলেন। তখন তাঁর এই

আশ্চর্য অতি সুন্দর গানের রূপ দেওয়ার জন্য আশ্চর্য সুন্দর কণ্ঠ নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতা এলেন শ্রীমতী প্রমোদাবালা। তখন ঢাকার রেকর্ডিং রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন হেমচন্দ্র গুহ মহাশয়। আর গৌরদা মানে গৌর বসাক ছিলেন ঢাকার একজন বিশিষ্ট তবলিয়া। তিনি প্রমোদাকে রিক্রুট করে নিয়ে এলেন। এক অদ্ভুত কণ্ঠ ও সত্যিকারের সুর ছিল প্রমোদাবালার কণ্ঠে। তাঁর গাওয়া কয়েকটি গান আমি উল্লেখ করছি - তেপান্তরের পথে বঁধু হে একা বসে থাকি, চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনিঝিনি বাজে লো। সাঁওতালি গানও বাংলা গানের জগতে একটা নতুন দিক খুলে দিল। এই গানের ভিতরেই আমরা শুধু নীল আকাশ, মহুয়া বা শালবনই নয়, সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার সাড়া পেতে লাগলাম। সেই সময় আরেকটি অপরূপ কণ্ঠের অধিকারিণী গানের জগতে এলেন, তিনি হলেন শৈলদেবী। এখন তিনি পরলোকগতা। এই শৈলদেবীর কণ্ঠ কাজী সাহেবকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। শৈলদেবীর কণ্ঠের অপূর্ব সুর ও কাজীদার অপূর্ব কথার একটা প্রণয় ঘটেছিল। শৈলদেবীর গাওয়া একটি গান মনে পড়ছে - 'প্রিয়তম এত প্রেম দিওনাকো আমায়, তটিনীর বুকে ঝাঁপায়ে পড়িলে কেন মহা পারাবার।' এই শৈলদেবী কাজীদার অনেক গান গেয়েছেন, যে গানগুলি বাংলা গানের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবার মতন। আগেও বলেছি যে ক্রমশ বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজী সাহেবের মনের যেন একটা দরজা খুলে গেল। যে দরজা দিয়ে তিনি এক অতীন্দ্রিয় জগৎ দেখতে শুরু করলেন। যোগসাধনা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ জাগলো এবং আমি জানি গভীর রাতে তিনি সেই যোগসাধনা করতেন। সেই সময়ে তাঁর হাত দিয়ে বহু সুন্দর সুন্দর শ্যামাসংগীত বেরোয়। তাঁর শ্যামাসংগীতকে কিন্তু জনপ্রিয় করে তোলেন মৃণালকান্তি ঘোষ। তাঁর অপূর্ব দরাজ কণ্ঠে 'বল রে জবা বল' বা 'মহাকালের কোলে এসে' ইত্যাদি গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ও কাজী সাহেবের একটি বিখ্যাত এবং আমার মতে কাজী সাহেবের শ্রেষ্ঠ শ্যামাসংগীত, রেকর্ড করেছিলেন। গানটি হলো 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা'। এমনি করে তাঁর গানের ধারাটা যেন অন্যদিকে ঘুরে গেল। যেন মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বলোকে কোনো এক অদৃশ্য দেবতা বা অদৃশ্য প্রেমিকের উদ্দেশ্যে তাঁর গান নিবেদিত হতে লাগলো। তারপর তিনি অসুস্থ হলেন এবং সে অসুস্থতা তাঁর ইহজীবনে সারলো না।" (প্রণব রায়, কাজী সাহেবের গান ঃ সঙ্গপ্রসঙ্গ', "দেশ বিনোদন" কলকাতা ১৩৯১)

কানন দেবীঃ

কানন দেবী ছিলেন নজরুলের সমকালে সিনেমা জগতের একজন বিশিষ্ট অভিনেত্রী এবং 'সুকণ্ঠী গায়িকা'। নজরুল সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিচারণে কাননদেবী বলেনঃ শুনেছিলাম তিনি বিদ্রোহী কবি-তাঁর কাব্য তরুণ সম্প্রদায়ের সংগ্রামের প্রেরণা-পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করাই তাঁর জীবন সাধনা। তিনি যোদ্ধা, বীর এমনই অনেক কিছু। এসব শুনে অজ্ঞাতেই তাঁর প্রতি মনটা শ্রদ্ধালু হয়েছিল কারণ স্বাধীনতা মুক্তি তারুণ্যের রঙিন স্বপ্ন এসবের প্রতি কার না আকর্ষণ থাকে?

একদিন জে. এন. ঘোষ মেগাফোনের রিহার্সাল রুমে কবির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে চেয়ে দেখি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক হার্মোনিয়ামের সামনে বসে আস্তে আস্তে বাজাতে বাজাতে গুণ গুণ করে সুর ভাঁজছেন চোখ বুজে কখনও এধার ওধার তাকাচ্ছেন, কিন্তু কোনো কিছুর উপরই ঠিক যেন মন নেই। এক সময় হার্মোনিয়াম থামিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। দীপ্ত দুটি চোখের উজ্জ্বলতার মধ্যেই যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব কথা বলে উঠল। ঐ চোখ দুটিই যেন তাঁকে দেখিয়ে দেয়। পরিচয় হওয়া মাত্রই হয়তো বা সঙ্কোচ ভাঙাবার জন্যই খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার গান ও গলার প্রশংসা শুরু করে দিলেন। খুব প্রাণখোলা হাসিখুশি স্ফূর্তিভরা মানুষ - যাকে বলা যায় আনন্দময় ব্যক্তিত্ব।

জে. এন. ঘোষ শিল্পীদের যত্ন করতেন ঠিক যেন মাতৃস্নেহে। "আমার ত খিদে পেইয়েছে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে কাননেরও খিদে পাচ্ছে। দাদা, এবার একটু তৎপর হন" - বলে উদার হাসিতে কাজী সাহেব ঘর ভরিয়ে দিলেন।

জে. এন, ঘোষ ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে থালাভরা খাবার মিষ্টি আর একটা প্লেটে পানর্জদার স্তুপ হাজির করতেই 'খাও' বলে একরাশ মিষ্টি আমার হাতে তুলে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সব খাবার নিঃশেষ করে ফেললেন। হৈ চৈ করে যেমন একসঙ্গে বিস্ময়কর পরিমাণ খেতে পারতেন ঠিক তেমনি বিস্ময়করভাবেই ঘন্টার পর ঘন্টা নাওয়া খাওয়া সম্বন্ধে বেহুঁশ হয়ে শুধুমাত্র সুররচনা নিয়েই মেতে থাকতে পারতেন। আর সে কি আশ্চর্যজনকভাবে মেতে থাকা! না দেখলে কল্পনা করা যায় না। কখনও যদি কোনো সুর মনে এল তারই সঙ্গে মিলিয়ে কথা বসানো, কখন বা কথার তাগিদে সুর।

আমি তো রাগরাগিণী কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না কি সীমাহীন ব্যাকুলতায় তিনি কথার ভাবের সঙ্গে মেলাবার জন্য হারমোনিয়াম তোলপাড় করে সুর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঠিক যেন রাগের মর্ম থেকে কথার উপযুক্ত দোসর আন্বেষণ।

আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বলতেন, "ডাগর চোখে দেখছ কি? আমি হলাম ঘটক, জানো? এক দেশে থাকে সুর, অন্য দেশে কথা। এই দুই দেশের এই বর কনেকে এক করতে হবে। কিন্তু দুটির জাত আলাদা হলে চলবে না। তা হলেই বে-বনতি। বুঝলে কিছু?" বলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকাতেন। আমি মাথা নেড়ে স্পষ্টই বলতাম "না বুঝিনি"। বলতেন "পরে বুঝবে।" পরে বুঝেছি কিনা জানি না তবে এইটুকুই আজ পর্যন্ত বুঝবার কিনারায় এসেছি যে কথার মত অতি বাস্তব বস্তুর বুকেও অসীমে ব্যাপ্ত হবার তৃষ্ণা জাগানো এবং সুরের মত অধরাকেও কথার মাধুর্যে বন্দী করার মিলন উৎসবে যিনি আত্মহারা- তাঁর কবিকৃতিকে উপভোগ করা যতখানি সহজ, ব্যক্তিত্বকে বোঝাটা ঠিক ততখানি নয়।

ছবির গান ও সুর বাঁধার সময়ও দেখেছি কত প্রচণ্ড আনন্দের মধ্যে কি প্রবলভাবেই না কবি বেঁচে উঠতেন, যখন একটা গানের কথা ও সুর ঠিক তাঁর মনের মত হয়ে উঠত। মানুষ কোন প্রিয় খাদ্য যেমন রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করে কাজী সাহেব যেন তেমনি করেই নিজের গানকে আস্বাদ করতেন।

শেখাতে শেখাতে বলতেন - "মনে মনে ছবি এঁকে নাও নীল আকাশ দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। তার কোনো সীমা নেই, দুদিকে ছড়ানো তো ছড়ানোই। পাহাড় যেন নিশ্চিন্ত মনে তারই গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশের উদারতার বুকে এই নিশ্চিত মনে ঘুমোনোটা প্রকাশ করতে হলে সুরের মধ্যেও একটা আয়েস আনতে হবে। তাই একটু ভাটিয়ালীর ভাব দিয়েছি। আবার ঐ পাহাড় কেটে যে ঝর্ণা বেরিয়ে আসছে তার চঞ্চল আনন্দকে কেমন করে ফোটাব? সেখানে সাদামাটা সুর চলবে না। একটু গীটকিরি তানের ছোঁয়া চাই। তাই 'বো-ওও-ও-অই-' বলে ছুটলো ঝর্ণা। আত্মহারা আনন্দে।" এমনি করে তিনি এই মেলানোর আনন্দ আমাদের হৃদয়েও যেন ছড়িয়ে দিতেন। (কানন দেবী, 'কবি প্রণাম,' "নজরুল কথা" বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, কলকাতাঃ সাহিত্যম, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৪)

কমল দাশ গুপ্ত ঃ

কমল দাশ গুপ্ত ছিলেন নজরুলের অত্যন্ত প্রীতিভাজন এবং সংগীত জগতে তাঁর ঘনিষ্ট সহচর। নজরুল সংগীতের সুরারোপে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত গুণী। স্মৃতিচারণে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ "হঠাৎ একদিন শুনলাম আমার ছোটবোন সুধীরার গান রেকর্ড হবে এবং সেই গান কাজী সাহেব লিখবেন এবং তিনিই সুর দেবেন। শেখাবেন ও তিনি। কাজী সাহেব লোকটা যে কে চিনতে পারিনি। আমার দেখা নজরুল ইসলামকে যে বড় ভাই কাজী সাহেব বলতেন তাতো জানতাম না। যাই হোক শুরু হল আমার বোন সুধীরার গান শেখা চিৎপুর রোডে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুমে। বড় ভাইয়ের ওপর অভিমান হলো। দুজন একসঙ্গে গান শিখেছি, তার ওপর আমি হলাম বড়, আর আমার আগেই ছোট বোনের রেকর্ড হবে। আরো শুনলাম সেখানে নাকি বড় বড় শিল্পীরা আসেন। গান শেখান।

কবি প্রণব রায়ের মুখে কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনে আবার নতুন করে বিপদে পড়লাম। আমার দেখা স্বদেশীওয়ালা, বড় ভাইয়ের কাজী সাহেব এবং প্রণব রায়ের কাজী নজরুল ইসলাম যে এক লোক কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না। আমার অবস্থা দেখে প্রণব রায় আমার বোন সুধীরার গানের প্রথম কলি 'আনো সাকী শিরাজী, শুনিয়ে প্রমাণ করে দিলেন তিনিই কাজী নজরুল ইসলাম।

১৯৩০ সালের দিকে বড় ভাই টুইন রেকর্ডের সংগীত পরিচালক ও সুরকার নিযুক্ত হন। কিন্তু ম্যাজিক দেখাবার কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হত বলে ঠিক হয় তাঁর অনুপস্থিতিতে আমিই কাজ চালিয়ে দেব। অর্থাৎ বড় ভাইয়ের সুর করা গানগুলি আমি

শিল্পীদের শিখিয়ে রেকর্ড করার উপযুক্ত করে রাখবো। কিছুদিন কাজ করার পর বুঝলাম যে বড় ভাই সময় পাবেন না। সব কাজ আমাকেই করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে অর্থাৎ সেশনের পরে টুইনের কর্তা ওয়াহেদ সাহেব (মুন্সীজী) আমাকে ট্রেনার ও কম্পোজার নিযুক্ত করলেন। এই ওয়াহেদ সাহেবের অনুগ্রহ না হলে আমি এত কম বয়সে এইচ. এম. ভি-র মিউজিক ডিরেক্টর হতে পারতাম না।

তাতো হল। কিন্তু নামী শিল্পীরা আমার কাছে ট্রেনিং নেবেন কেন। কমলা ঝরিয়া আপত্তি জানালেন। শেষে এ নিয়ে একটা মিটিং পর্যন্ত হয়ে গেল। সেই মিটিং-এ ছিলেন মুন্সীজী, ভগবতীবাবু, বড় দলের দুজন সুরকার ও কাজী নজরুল ইসলাম। শুনেছি নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, আমি কমলের সুর করা কিছু টুইন রেকর্ড শুনেছি, আমার তো ভালই লেগেছে। আর সে নিজেও অপূর্ব গায়। এর পর ঠিক হলো আমি হিজ মাস্টারস ভয়েস-এও সুর দেব, আর টুইনের কাজ আগের মতই থাকবে।

আমার সুর নজরুলের ভাল লেগেছে। তাঁর লেখা গানে সুর দিতে পারবো, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারবো ভেবে আমার আনন্দের সীমা রইল না। পরের দিন প্রণব রায়ের লেখা ৩০টি গান নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। আর সকলের মত আমিও কাজীদা বলে সম্বোধন করে গানগুলি তাঁকে দিয়ে প্রণব রায়ের আর্থিক কষ্টের কথা জানালাম। গানগুলি চলবে কি না তাঁর মতামত চাইলাম। কাজীদা তখনই কয়েকটি গান দেখলেন এবং বললেন, বাঃ ছেলেটি বেশতো গান লেখে, কবিতা আর গানের মধ্যে বেশ তফাৎ আছে জানিস? ছেলেটিকে বলিস যেন গান লেখা ছেড়ে না দেয়।

এ ব্যাপারে তিনি যে কতখানি নিজের ক্ষতি করলেন তা জানলাম পরে। অন্য গীতিকারের একটি গান রেকর্ড করা মানে কাজীদার একটি গানের পয়সা হারানো। নিজের আর্থিক প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে তিনি প্রণবকে সাহায্য করলেন।

বয়স কম বলে চারদিক থেকে এমন বাধা আসছিল যে শিল্পীদের শেখাবার একটি ঘরও পাচ্ছিলাম না। কাজীদারও ঘরের অভাব হতো। অনেক সময় দোতলার হিন্দী বিভাগের একটি ঘর খুলিয়ে নিয়ে তিনি কাজ করতেন। আমি এক দিন কাজীদার শরণাপন্ন হলাম। আশ্চর্য, তিনি আমার কথা শুনেই বললেন - আমাকে আগে বলিস নি কেন। আমি বড়বাবুকে বলে সব ঠিক করে দিতাম।

বড়বাবু আমাকে বললেন, কমল ভাই, যুথিকা রায় নামে একটি মেয়ে দুবার রেকর্ড করেছিল কিন্তু ভাল হয়নি, তুমি কি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে? দুয়েকদিনের মধ্যে যুথিকা রায় এল। যুথিকার বেশভুষায় অবাক হয়েছিলাম। কারণ তার গায়ে কোন গায়না ছিল না এবং সাদা শাড়ী ও সাদা ব্লাউজ দেখে মনে হত বিধবা মেয়ে। এই সাজ থেকে প্রণব রায় তার জন্য প্রথম গান লিখেছিলেন 'আমি ভোরের যূথিকা', সাঁঝের তারকা আমি।' এ-দুটি গান রিহার্সাল করার সময় সবার খুব ভাল লেগেছিল। সেই কারণে কাজীদাও তার জন্য দুটি গান লিখে দিয়েছিলেন।

একদিন কাজীদা আমায় ডেকে বললেন, কমল খুব সাবধান, ডিলাররা কিন্তু যুথিকার গানটি বাতিল করে দিতে পারে। তুই বড়বাবুকে বলে রাখ তিনি যেন নিজের ক্ষমতায় রেকর্ডটি বাজারে চালু রাখেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম রেকর্ড বাতিল বা পাশ করা আমাদের কাজ, ডিলাররা এর মধ্যে আসে কি করে।

কাজীদা বললেন, ডিলাররা বড় সাহেবকে জানিয়েছেন যে তারা বেচাকেনা করেন, সুতরাং গ্রাহকদের পছন্দ অপছন্দ তাঁরা আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। বাছাই করার ভার তাঁদের ওপর দিলে রেকর্ডের বিক্রি ভাল হবে। ব্যবসার উন্নতির আশায় বড় সাহেব এতে রাজী হয়েছেন। কলকাতার গ্রামোফোন ডিলার এসোসিয়েশন খুব শক্তিশালী।

বড়বাবুকে সব বললাম। তিনি চুপ করে রইলেন।

এলো সেই বিপদের দিনটি। আমাদের বাছাই করা দশটি রেকর্ড নিয়ে তাঁরা বসলেন, যেন কতবড় সংগীত সমজদার। আমি ও প্রণব রায় দরজার বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তাঁদের মতামত শোনবার জন্য। কমলা ঝরিয়ার ভাটিয়ালী গান 'ও বিদেশী বন্ধু', বাজানো শেষ হতেই একজন বলে উঠলেন, এটা কি করলেন বড় বাবু, কমলার গলায় দাদরা ঠুংরী শোনার জন্য শ্রোতারা পাগল। আর আপনি তাকে দিয়ে ভাটিয়ালী করালেন? বড় বাবুর উত্তরের পরে তাঁরা অসন্তুষ্টভাবে রেকর্ডটি পাশ করলেন।

এবার যুথিকার পালা। 'আমি ভোরের যূথিকা' আরম্ভ হতেই লক্ষ্য করলাম সেই সদস্য ভুরু কুঁচকে পাশের সদস্যের দিকে তাকালেন। শেষ হবার আগেই বলে উঠলেন, এটা আবার কি গান? না রবীন্দ্রসংগীত, না আবৃত্তি, না অর্কেস্ট্রা সংবলিত। এ রেকর্ড চলবে না।

আমরা দুজনাই কাজীদার ঘরে গেলাম। সব শুনে তিনি হেসে বললেন, তোর অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত তুই থাকবি, ওরা চলে যাবে।

অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর নবাগত যূথিকা রায় ও সেরা শিল্পী কমলা ঝরিয়ার রেকর্ড দোকানে দোকানে বাজতে লাগলো। যখন বড় বাবুর মুখে শুনলাম যে বিক্রীর দিকে যুথিকার রেকর্ড প্রথম আর কমলার রেকর্ড দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে তখন আমার আর প্রণবের আনন্দ আর ধরে না। কাজীদাকে খবরটি দিলাম। তিনি আনন্দে মিষ্টি আনিয়ে সবাইকে খাইয়ে দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

কাজীদাকে বললাম রেকর্ডের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ডিলারদের যে বিচার ক্ষমতা নেই এতে প্রমাণ হয়ে গেল। তাদের বাতিল রেকর্ড সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়েছে। এই সুযোগ ছাড়লে চলবে না। বড় সাহেবকে বলে ডিলারদের রেকর্ড পাশ করার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। কাজীদা প্রথম ইতস্তত করছিলেন আমার ক্ষতি হতে পারে আশঙ্কা করে। পরে তিনি বড় বাবুকে দিয়ে সাহেবকে বলিয়ে এ ব্যবস্থা বাতিল করান। কাজীদার এই সমর্থন যদি না পেতাম তবে এতবড় কাজটা কিছুতেই হত না। সকলে যখন আমার

বিরুদ্ধে তখন কাজীদাই আমার একমাত্র সহায়। প্রকৃত গুণের প্রশংসা করতে বা নতুনকে উৎসাহ দিতে তিনি কখনো কুণ্ঠা করতেন না।

এ সময় থেকে আমার কাজের চাপ বেড়ে গেল। টুইন তো আছে, হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের কাজ অনেক বেশী পেলাম। এতে যূথিকাকে দিয়ে হিন্দী বিভাগে প্রবেশের একটা পথ খুঁজে পেলাম। আমার আগে কোন বাংলাভাষী সুরকার হিন্দী রেকর্ড করবার সুযোগ পাননি। এসময়ে আমার ও কাজীদার প্রতিদিনের সময়সুচী দেখলে বোঝা যাবে কী পরিশ্রম করতে হতো আমাদের।

সকাল আটটায় রিহার্সালরুমে এসেই কাজীদা প্রথম শিল্পীর জন্য গান রচনা করতেন বা সুর দিতেন। আমিও হয় সুর দিতাম না হয় ভজনের বই থেকে গান বেছে নিতাম। নটার মধ্যে শিল্পীরা এসে যে যার শিক্ষকের ঘরে চলে যেতেন। তারপরে আসতেন দ্বিতীয় দলের শিল্পীরা এসে যার যার শিক্ষকের ঘরে চলে যেতেন। তারপরে আসতেন দ্বিতীয় দলের শিল্পীরা। এভাবে বেলা তিনটা পর্যন্ত আমাদের রিহার্সাল চলতো। এ সময়ের মধ্যে আমরা দম ফেলতে পারতাম না। তিনটায় রিহার্সাল শেষ করেই শুরু হত পরের দিনের শিল্পীদের গান তৈরী করা। সে কাজ শেষ হতেই সন্ধ্যা ছয়টা বেজে যেত। এই তিন ঘন্টা শুধু আমরা দুজন থাকতাম। কখনো আমি ওনার ঘরে যেতাম, কখনো উনি আমার ঘরে আসতেন। এই তিন ঘন্টা কাজের কথা, ঘরের কথা, গানের ভবিষ্যত ও শিল্পীদের কথা হত। সন্ধ্যা ছয়টায় পরে কাজীদা চলে যেতেন। কাজীদা ও আমি বছরের পর বছর দিনের বেলা ভাত খাইনি। বাড়ী থেকে খাবার আনিয়েও দেখেছি সব খাবার পড়ে থাকতো। কাজীদার ছিল চা ও পান, আমার ছিল চা-সিগারেট।

টুইন রেকর্ড কাজীদাকে ও আমাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়েছে। কাজীদা নগদ টাকায় টুইনের গান লিখতেন এবং টাকাটা তাঁরই হাতে আসতো। আর হিজ মাস্টার্সে রয়্যালটি নিয়ে কাজ করতেন। কিন্তু শুনতাম যে রয়্যালটির টাকা তাঁর হাতে আসতো না। যাদের কাছে বইয়ের স্বত্ব বন্ধক বা বিক্রী করেছিলেন তাদের কাছে চলে যেতো। পরবর্তীকালেও কাজীদার লেখা টুইনের গানগুলি কম কাজে লাগেনি। কাজীদার কর্মময় জীবন যখন হঠাৎ থেমে গেল, তখন তাঁর গানের স্বত্ব নিয়ে ঝামেলা শুরু হল। কাজীদার কোনো নতুন গান জোগাড় করে নিয়ে গেলে হবে না। গ্রামোফোন কোম্পানি স্বত্বাধিকারীর নাম ও অনুমতিপত্র না পেলে রেকর্ড করবে না। কারণ তারা আইনের ঝামেলায় যাবে না। ডি. এম. লাইব্রেরী বলবে তার স্বত্ব, মেগাফোন জানাবে তার দাবী। এই অবস্থায় টুইনের গানগুলো রেকর্ড করা হলো, কারণ সেগুলি গ্রামোফোন কোম্পানি নগদ টাকায় কিনেছিল। ত্রিশ দশকে সে সময় অনেক রেকর্ড কোম্পানি গজিয়ে উঠেছিল, সেই মুহূর্তে সুযোগ বুঝে মেগাফোনের মালিক জিতেন ঘোষ কাজীদাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে অনেক গান লিখিয়ে নিয়েছিলেন। ও সময় চিত্তরায় কাজীদার সহকারী ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি একটা খাতাই নাকি কাজীদা জিতেন ঘোষের কাছে জমা রেখেছিলেন। এই খাতাটি পরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। জিতেন ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকমল ঘোষও খোঁজাখুঁজিতে অনেক সাহায্য করেছেন, কিন্তু খাতাটি পাওয়া যায় নি। মেগাফোনে কাজ করতে দেখে হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানিও তাঁকে দিয়ে অনেক গান লিখিয়ে নেয়। ...

সুরকাররা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সুর করে থাকেন। এ সম্পর্কে কাজীদাকে প্রশ্ন করেছিলাম। কাজীদা বলেছিলেন, গজল গানের সুর করা সহজ, কারণ তার একটা ছক আছে। উর্দু সাহিত্যের সম্পদ গজল। তার উৎপত্তিস্থান লখনৌ এবং লাহোর। যে সকল সুরকার ভাল ভাল গজল শুনেছেন তাঁদের পক্ষে সেই সকল সুরের সাহায্য নিয়ে বাংলা গজলে সুর করা সহজ হয়। গজল গানে মাত্র দুটি লাইনের সুর করলেই সম্পূর্ণ গানের সুর হয়ে যায়। কারণ ওদুটি লাইনের সুরেই সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। এই কারণেই গজল একঘেয়ে হতে বাধ্য, কিন্তু যোগ্য শিল্পীরা তাঁদের কৃতিত্বে একঘেয়েমী কাটিয়ে গজলকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। বাংলা দাদরা ঠুংরী সম্পর্কে আমাদের দুজনার মত একই ছিল। এই দুটিও আমরা উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্তানী সংগীতের মাধ্যমে পেয়েছি, এবং জনপ্রিয় হিন্দী গানগুলির সুরের ওপর বাংলা কথা বসানো হয়। সুরকারের নিজস্ব অবদানে বাংলা দাদরা ও ঠুংরীকে চিত্তাকর্ষক করে তোলা হয় এবং শিল্পী অলংকার দিয়ে সাজিয়ে দেন।

কাজীদা বললেন, বিশেষ ধরনের গান যখন করতে বসি তখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রথম দুটি লাইনের সুর করি এবং আজেবাজে কথা বসিয়ে সুরটাকে ধরে রাখি। হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে এবার ওই দুই লাইনের কথা বদল করি। মনের মতন কথা পেলেই সম্পূর্ণ গানটি লিখে ফেলি, অবশ্য ওই দুই লাইনের ছন্দ বজায় রেখে। আমি বললাম, প্রথম দু'লাইনের মত হারমোনিয়ামে অন্য লাইনের সুর করলেন না। কেন?

নারে, সম্পূর্ণ গানটা সুরের ওপর লিখতে গেলে গানের কথা দুর্বল হয়ে পড়ে, আর লিখতেও কষ্ট।

আধুনিক গানের কথা উঠতে কাজীদা একটু ঠেস দিয়ে বললেন, তোদের এই আধুনিক গানের সুর আমার দ্বারা হবে না, তাইতো আধুনিক গান নিজে থেকে লিখিনা। ধীরেন (সহকারী ধীরেন দাশ) মাঝে মাঝে জোর করে লিখিয়ে নেয়।

গান লেখার এবং সুর করার জন্য মুডের প্রয়োজন আছে কি? এই প্রশ্নে কাজীদার জবাব, রেখে দে তোর মুড। কখন মুড আসবে সে আশায় বসে থাকলে রেকর্ড জগতে আর কাজ করতে হবে না। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন এই আলোচনা শুধু রেকর্ড সংগীতের ওপর।

কাজীদা বললেন, এখানে কাজ বাধ্যতামূলক। শিল্পী এখনি গান শিখতে আসবে আর রেকর্ড করার দিন স্থির হয়ে আছে, বাজিয়েরা সেই অনুযায়ী অপেক্ষা করছে, সুতরাং তোমাকে তখন সুর করতেই হবে ভাল হোক মন্দ হোক। আমার প্রশ্নঃ তবে কি

সুর করার ওপর মুডের কোন প্রভাব নেই? কাজীদা বললেন, নিশ্চয় আছে। অনেক সময় দেখেছি প্রথম লাইন সুর করার পর আর যেন বেশী ভাবতে হচ্ছে না বা খুঁজতে হচ্ছে না। সুর যেন নিজেই এসে কথার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে গানটির সুর হয়ে গেল। লক্ষ্য করেছি সেই সুর শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে।

কাজীদা খুব কমদিন দমদম স্টুডিওতে রেকর্ডিং করতে যেতেন। কারণ রেকর্ডিং সেরে ফিরে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেতো। আর কোন কাজ করার ইচ্ছা বা সময় থাকতো না। তিনি ওই দিনগুলি নিরিবিলি পেতেন এবং বিশেষ গানগুলি লিখতেন বা সুর করতেন।

১৯৩৭ সালে শ্রীমতী ইন্দুবালা ও শ্রীমতী আঙুরবালা ছাড়া পেশদার শিল্পী প্রায় ছিল না বলা যায়। বড়দের মধ্যে ছিলেন কাজীদা, তাঁর সহকারী ধীরেন দাশ, কমিক গানের শিল্পী রঞ্জিত রায়। রিহার্সাল ঘর স্থানান্তরিত হয়েছে নলিন সরকার স্ট্রীটে। এটা আমাদের দাবীতেই হয়েছে। এসময় আমাদের মধ্যে ভালভাবে টিম ওয়ার্ক হতো। বিদেশী সংগীতের মধ্যে কিউবান গানের কতগুলি রেকর্ড আমাদের ভাল লেগেছিল। তারই একটি সুরের ওপর কাজীদা লিখেছিলেন 'দুর দ্বীপবাসিনী'। এই গানটি প্রথমে রেকর্ড করেছিলেন অনিমা বাদল, পরে ফিরোজা বেগম। গানটি লেখার আগে রেকর্ড থেকে সুরটি তুলে নিতে হবে। যার উচ্চাঙ্গ সংগীতে এবং সুরের ওপর দখল আছে তার পক্ষেই এটা করা সম্ভব। সবাই চুপ করে আছে। আমিই রাজী হলাম। কিন্তু সময় পেলাম মাত্র একটি দিন। আমি ও পরিতোষ শীল (বেহালা) মিলে কাজটি করে দিলাম। কাজীদাও একদিন সময় নিলেন এবং একদিন পরে অনিমাকে গানটি তুলে দেওয়া হল। সমস্যা দেখা দিল বাজনা নিয়ে। ওবো নামে একটি যন্ত্র আসল রেকর্ডে বেজেছিল। কলকাতায় সেটা পাওয়া গেল না। ওবো পাওয়া যাবে না শুনে ট্রাম্পেট বাজিয়ে আব্দুল হাকিম (পাঞ্জাব) নিজে এগিয়ে এসে বললেন, কাজী সাহেব, আমার কাছে একটি মিউট ('ছোট চোঙ') আছে যা ট্রাম্পেটের মুখে লাগিয়ে বাজালে ওবোর মত শোনাবে। এবার সমস্যা হল ঢোলক নিয়ে। মূল রেকর্ডে একজাতীয় ঢোলক বেজেছে। ও রকম ঢোলক আমাদের ছিল না। যন্ত্রসংগীতের পরিচালক রঞ্জিত রায় খুব মনোযোগ দিয়ে রেকর্ডটি শুনে বেরিয়ে গেলেন। সবাই আমার 'দুর দ্বীপবাসিনী' নিয়ে ব্যস্ত, গানটিকে সার্থক করতে হবে। হঠাৎ রঞ্জিত রায় ঘরে ঢুকলেন হাতে একটি ঢোলক নিয়ে। যা হোক ঢোলক তো হলো কিন্তু ওরা যে রকম বাজিয়েছে, সে রকম তো হচ্ছে না। কিন্তু রঞ্জিত রায় ছাড়বার পাত্র নন। প্রথমে চটা দিয়ে বাজালেন তারপর দুহার দিয়ে বাজালেন, মনে হচ্ছে কিছুটা মিলেছে। সেই যে রিহার্সাল শুরু করলেন শেষ হলো সন্ধ্যায়। সমস্ত কাজ ছেড়ে রঞ্জিত রায় শেষ পর্যন্ত সার্থক নকল করে ছাড়লেন। রেকডিং হয়ে গেল, সবার মুখে হাসি। গীতিকার কাজীদা, কিন্তু সুরকার কে? যন্ত্র পরিচালক কে? কার কৃতিত্ব? এসব প্রশ্নই ওঠেনি।

.... গান লিখতে মুডের দরকার হয় কি না এ নিয়ে আর একদিন কাজীদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি দেখেছি শৈলেন রায়, প্রণব রায় অনেকদিন গান লেখার চেষ্টা করেও 'না ভাই আজ আর হল না' বলে কলম ফেলে রেখে দিয়েছেন। আবার কোনো দিন অল্প সময়েই লিখে দিয়েছেন। কাজীদা বললেন, ঠিক বলেছিস, গান আর কবিতা লিখতে মুড দরকার হয়।

কিছুক্ষণ পরে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। শ্যামাসংগীতের নামী শিল্পী মৃণালকান্তি ঘোষ আমার সুরে দুটি শ্যামাসংগীত রেকর্ড করবেন, কিন্তু আমি কাজীদাকে দুদিন পর্যন্ত চেষ্টা করেও গান দুটি আদায় করতে পারিনি। তৃতীয় দিন সব কাজ ছেড়ে তাঁকে পাকড়াও করলাম। তিনিও যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমার ঘরে এসে বললেন, খিদে পেয়েছে কিছু খাবার আনতে দে। দশরথকে পয়সা দিলাম খাবার আনতে। কাজীদা খাতা পেন্সিল বের করে কাজ শুরু করলেন।

কাজীদা কখনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে, কখনো কোলের ওপর তাকিয়া রেখে তার ওপর খাতা পেন্সিল নিয়ে লিখতেন। লেখার সময় কেউ যদি খাতার ওপর দৃষ্টি রেখে পাশে বসে থাকতেন তা হলে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন, এমন কি তাকে সরে যেতে বলতেন। আবার অনেক সময় নিজেও সরে বসেছেন। আমি তাঁর পেন্সিলের খস খস শব্দে বুঝতে পারছিলাম যে বেশ তাড়াতাড়ি লেখা চলছে। কাজীদা একটা গান আমার হাতে দিলেন। আমি গানটি দেখেই বললাম, কাজীদা, শেষে কি আমার সঙ্গেও সেমসাইড করলেন?

এর অর্থ খুব অসুবিধায় পড়লে কাজীদা মাঝে মাঝে জেনে শুনেই একটা পুরনো গান খাতা থেকে কপি করে দিয়ে সেদিনের মত নিজেকে রক্ষা করে পরের দিন একটা নতুন গান দিয়ে বলতেন, ওভাই, তোমায় যে গানটি দিয়েছি সেটি অন্য একজন রেকর্ড করছে এই নাও তোমার জন্য নতুন গান এনেছি। এই ব্যাপারগুলি আমার জানা ছিল। তাই সেমসাইড বলতে কাজীদা বেশ কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপরে বললেন, না রে তাও কি হয়।

হঠাৎ দেখি কাজীদা গম্ভীর হয়ে আবার খাতা পেন্সিল ধরেছেন। আর খস খস শব্দ হচ্ছে। এর মধ্যে খাবার এসে পড়লো। কিন্তু আমি জানি কাজ শেষ না হলে খাবারের কথা বলে কিছু লাভ হবে না। সুতরাং অপেক্ষা করলাম। একটু পরেই বললেন, এই নে। যাক তোর দুটো গানই হয়ে গেল।

খাবার কথা বললে এক গ্লাস জল দিতে বলে আবার ধ্যান মগ্ন। আবার খস খস শব্দ। আমার দুটি শ্যামাসংগীত হয়ে গেল, এখন কার জন্য লিখছেন? সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার তখন ওস্তাদজীর ঘরে যেতে হবে। নিজে নিজে বলতে লাগলাম, এতগুলি খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর দেরি করলে কি খাওয়া যাবে? এর উত্তরে শুনলাম, তোর যদি কোন কাজ থাকে তবে তুই যা আধ ঘন্টা পরে আসিস।

অনেক ভেবে শেষে উঠে পড়লাম। ওস্তাদজীর ঘরে গিয়ে দেখি তিনিও আসেন নি। আবার উপরে উঠে এলাম। দুই পিয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে বসে রইলাম। আধঘন্টা পরে কাজীদাকে কি অবস্থায় দেখবো জানি না। এক পিয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি সেই ধ্যানমগ্ন খস খস চলছে। আমি বুঝতে পারলাম না কার জন্য খাওয়া ছেড়ে তিনি এমনি ডুবে রয়েছেন। এমন অবস্থায় তাঁকে আমি দেখিনি। যা হোক চা-র কথা বলে ধ্যান ভাঙালাম। তিনিও চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তবুও মন যে ডুবে আছে বুঝতে পারছিলাম। এই কি তবে গান লেখার মুড? সেদিন কি জানি কি হল কাজীদার, নাকি আমারই সৌভাগ্য। সেদিন আমার খাতায় ১২ খানা শ্যামাসংগীত লিখেছিলেন। সেদিনের তাঁর ধ্যানমগ্ন রূপ জীবনে ভুলতে পারিনি। এখনো তাঁর কথা ভাবতে বসলে মনে পড়ে সেই ধ্যানমগ্ন গীতিকার আর সুরকারের মূর্তিটি।

..... ১৯৩০ সালে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সালরুমে নজরুলগীতির যে পরিবারটি গড়ে উঠেছিল তাঁর কর্ণধার ছিলেন কবি স্বয়ং, এবং সহকারী ছিলেন ধীরেন দাশ ও পরবর্তীকালে চিত্তরায়, নিতাই ঘটক। সুরকাররূপে তিনি ও আমি। কণ্ঠ দিয়েছিলেন ইন্দুবালা দেবী, আঙুরবালা দেবী, কমলা ঝরিয়া, হরিমতী, কে মল্লিক, আব্বাসউদ্দিন, জ্ঞান গোস্বামী, মৃণালকান্তি ঘোষ, গিরীন চক্রবর্তী, সন্তোষ সেনগুপ্ত, সত্য চৌধুরী, শচীন দেববর্মন, যুথিকা রায়, দীপালি তালুকদার, সুধীরা সেনগুপ্ত, ফিরোজা বেগম, আমি এবং আরো অনেক। কবির কর্মময় জীবনে সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছেন এবং নজরুলগীতির ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন।" (নজরুলগীতি অন্বেষা, কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা ঃ ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৪৯-৫৯)

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ঃ

নজরুল যখন গানে পরিপুর্ণভাবে নিবিষ্ট সে সময় যাঁরা তাঁকে সর্বতোভাবে ভরিয়ে দিয়েছে সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নজরুল সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ঃ "কাজী নজরুল ইসলামের কবিকৃতির মূল্যায়ন ও বাংলা সাহিত্য তাঁর স্থান নির্ধারণ করবেন পণ্ডিত সমালোচকরা। সেকাজ আমার নয়। আমার জীবনের একটা অধ্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব জীবনের গতিপথ যে পালটে দিয়েছে সেকথা আমি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। জীবনের দুরূহ সাধনায় আজ যদি সংগীত জগতে বিরাট মণিহর্ম্যের সিংহদ্বার পথে প্রবেশের সামান্যতম অধিকার পেয়ে থাকি তা হলে সুরকার গীতিকার নজরুল ইসলামের কাছে আমার ঋণ জীবনে কোন দিনই ফুরোবে না। জীবনের অনেকগুলি বছর আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি। স্বদেশী আন্দোলনের কালে পথে প্রান্তরে সভা সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিদ্রোহের গান গেয়েছি। বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানিতে তাঁর সাহচার্য পেয়েছি। তাঁর কত সৃষ্টি মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছি।

একাধিক চলচ্চিত্রে তাঁর নির্দেশনায় কণ্ঠ দিয়েছি। বিরাট বনস্পতি স্নেহছায়ায় আমি সেদিন পথিক পাখী প্রাণভরে গান গেয়েছি। জীবনের সে মধুর দিনগুলি কি ভোলা যায়?

সময়টা ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম তখন বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত। পরাধীনতার বিরুদ্ধে বাংলার বিদ্রোহী যৌবনের তিনিই তখন নায়ক। তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহ কপাট' প্রভৃতি স্বদেশী গানের সুর বন্যায় বাংলার যুবজীবন তখন উদ্বেলিত। আমিও তখন বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এসেছি। ঘরের নিষেধ মানি নি। একটা বিষয়ে বিধাতার দয়া চিরদিন আমার উপর অকৃপণ বর্ষিত হয়েছে। অতি বাল্যকাল থেকেই তিনি আমাকে সুকণ্ঠ দিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন সংগীতের সহযাত অধিকার। পরিবারের সাংগীতিক পরিবেশে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে এলেও সংগীত আমাকে চিরদিনই আকর্ষণ করেছে। ভিতরের তাড়াতেই একদিন সোজা কাজী নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে হাজির হলাম স্বদেশী সংগীত শেখার জন্য।

কাজী নজরুল ইসলাম নামটি ঘিরে সেদিন প্রচণ্ড কৌতুহল। আশা নিরাশায় আন্দোলিত বুকে তাঁর কাছে হাজির হয়েছি। কি জানি কিভাবে গ্রহণ করবেন। তখন তিনি একধারে হিজ মাস্টারস ভয়েস, টুইন প্রভৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল ট্রেনার। বাংলাদেশের সুররাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তিনি আমাকে এত সহজে কাছে টেনে নেবেন। তিনি সযত্নে আমাকে তাঁর প্রতিটি জনপ্রিয় স্বদেশী গান শিখিয়েছেন। বিভিন্ন সভায় তাঁর সঙ্গে গাইতে নিয়ে গেছেন অথবা আমাকে পাঠিয়েছেন। ১৯৩২ সালে টুইন রেকর্ডে আমার প্রথম গান রেকর্ড করি তাঁর নির্দেশনায়। কাজীদার লেখা এবং তাঁরই সুর দেওয়া 'আমার বীণার মুর্ছনাতে বাজাও তোমার বাণী' ও 'চোখে চোখে চাহ যখন তোমরা দুটি পাখী।' এর পর কাজীদার লেখা ও সুর দেওয়া আরো অনেক গান রেকর্ডে গেয়েছি। তার মধ্যে চারখানা পল্লীসংগীত, দুইখানা শ্যামাসংগীত। .... কাজীদার সঙ্গে কাজ করার সময় যেমন দেখেছি তাঁর নিত্যনতুন গান রচনা ও সুর সৃষ্টির প্রতিভার আশ্চর্য প্রকাশ, তেমনি বিভন্ন পরিবেশে আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কাজীদার ব্যক্তিসত্তার বিচিত্র পরিচয় তখন যদি কাগজ কলমে মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখতে পারতাম তা হলে তাঁর সংগীত প্রতিভার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারতাম। আমি এ কথা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাস লেখা হলে গীতিকার ও সুরস্রষ্টারূপে কাজী নজরুল ইসলামের জন্য প্রথম সারির একটি বিশিষ্ট স্থান দিতেই হবে। বাংলা সংগীতে এত বৈচিত্র্যের সংযোজন আর কোন গীতিকার বা সুরকার করতে পারেন নি। কাজীদার সর্বাধিক কৃতিত্ব বিভিন্ন ধরনের সময়োচিত ও সর্বাধিক জনপ্রিয় সংগীত রচনায়। কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় সাড়ে তিন হাজার গান লিখেছেন। নজরুলের গানই সর্বাধিক সংখ্যক রেকর্ড হয়েছে। এদেশে গ্রামোফোন রেকর্ডে এও এক নতুন রেকর্ড স্থাপন। বাংলাদেশে এমন একদিন ছিল যখন কেবলমাত্র নজরুলের গানেই গ্রামোফোন কোম্পানি বেঁচে ছিল। ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের ওপর

কাজীদা অংসখ্য গান রচনা করেছেন ও সুর দিয়েছেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী অঙ্গের গান, গজল, ভজন, ভক্তিমুলক সংগীত (শ্যামা, ইসলামী, কীর্তন) বাউল, ভাটিয়ালী, ঝুমুর, সাঁওতালি, কাওয়ালী ইত্যাদি সব রকমের গান তিনি রচনা করেছেন। যদিও বাংলার জনসাধারণ নজরুলকে বিদ্রোহী গানের স্রষ্টা বলে জানেন, কিন্তু নজরুলের অন্যতম প্রধান অবদান হলো বিদেশী গজল গানকে বাংলা কথায় একেবারে বাংলা করে নেওয়া। নজরুলের আগে বাংলায় গজল গান এমন করে জনপ্রিয় হয়নি, এমন গজল ঢং এর গানও ছিল না। তাঁর রচিত 'কে বিদেশী বন উদাসী' এবং এ ধরনের গান এক সময় এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে হাটে-মাঠে সকলের মুখে গীত হতো। ভারতীয় সংগীতের রাগমহালা ও বিভিন্ন কুটরাগের উপরও তিনি বহুগান বেঁধেছেন। রাগরাগিণী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান খুবই গভীর ছিল। নিজের রচিত সংগীত সম্পর্ক তাঁর কোন গোড়ামি ছিল না। স্বরলিপির কঠোর বাঁধনকে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন না। সেজন্যে নজরুলের গান একসময় এমন বাঁধনকে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন না। সেজন্যে নজরুলের গান একসময় এমন পর্যায়ে ওঠে যে সেকালের অধিকাংশ খ্যাতনামা গুণী শিল্পী তাঁর গান গাইতেন। দিলীপ রায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ইন্দুবালা দেবী, আঙুরবালা দেবী, কমলা ঝরিয়া, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মন প্রমুখ শিল্পীগণ নজরুলের মূল সুর ধরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গান গাইতেন। এতে কাজীদা খুশী হতেন। কারণ শিল্পীর সৃজনীশক্তিকে তিনি উৎসাহিত করতেন।

নিজের জীবন ও সামাজিক ব্যাপারে কাজীদা গতানুগতিক পদ্ধতির যেমন ঊর্ধ্বে ছিলেন, কাব্যরচনার ক্ষেত্রে যেমন তিনি বিদ্রোহের বাণী প্রকাশ করেছিলেন, সংগীতের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। সুরজগতেও তিনি কোন বাঁধাবন্ধন বিধি নিষেধের গণ্ডী মানেন নি। যেমন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণীগুলির একটা সময় নির্দিষ্টতা আছে। যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা সকালের রাগ রাত্রে, কিংবা রাত্রের রাগ সকালে গাইতেন না। কিন্তু কাজীদা বলতেন, আমি যদি রাগের ভাবটা সৃষ্টি করতে পারি তা হলে এই সময়বন্ধনে অবদ্ধ থাকবো কেন? সকালের গেয় রাগটা যদি রাত্রে গেয়ে সকালের মেজাজ ও ভাব প্রকাশ করতে পারি তা হলে দোষ কোথায়? তিনি কয়েকটি গান লিখলেন যাকে বলা যায় সুরের জগতে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে তিনি জয়ী হয়েছেন, সংগীত জগতে নতুন সুর ও প্রাণশক্তি এনে দিয়েছেন।

'সন্ধ্যা মালতী যবে ফুলবনে ঝুরে---কে আসি বাজালো বাঁশি ভৈরবী সুরে' গানটিতে সন্ধ্যা ও সকাল দুই সময় সঙ্কেত রয়েছে। সন্ধ্যার সুরের সাথে সকালের সুরের মিশ্রণে একটি নতুন সুরের উদ্ভব হয়েছে। প্রথমে ভীমপলশ্রী রাগে বাঁধলেন, তারপর সপ্তকের কোমল ধৈবত দিয়ে নেবে এসে একেবারে কোমল ঋষভে এসে দাঁড়ালেন, তাতে ভৈরবীরূপটি পরিষ্কার ফুটে উঠলো। ভীমপলশ্রীতে গা নি ব্যবহারের নিয়ম, এর সঙ্গে ধা রে এমনভাবে ব্যবহার করলেন যে ভৈরবীর রূপ ফুটে উঠে মনে হল যে এটি না হলে গানটির রূপ হত না, এবং এটি বুঝি সন্ধ্যায় গেয় রাগ। 'রঙ মহলের রঙ মশাল

মোরা' এই গানটিতে তিনি ভৈরবী, আশাবরী, ভূপালী যোগ করে শ্রোতাদের একাত্ম করে ফেলেছেন। গানটির পঞ্চম লাইনেই আগে 'নৌবতে আমি প্রাতে আশাবরী - সাঁঝে কাঁদি ভূপালী,। আশাবরী এবং ভুপালী পাশাপাশি থাকলেও চতুরতার মধ্যে সুরারোপ হল যে, দুটি রাগ স্বতন্ত্র থেকে গেল। নিজের গানের মধ্যে রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি লাইনে রাগকে এমনভাবে প্রকাশ করতে পারতেন যাতে রাগসংগীতের রাগমালা বাংলা উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে সহজ হয়ে সাধারণ শ্রোতাদের অনুভবের মধ্যে এসে গেছে। বৈয়াকরণের কঠোর শাসনের পরিবর্তে সহজ সহযোগিতা পাওয়া গেছে। যাতে সুরের গতি স্বচ্ছন্দ ও মধুর হয়েছে।

সুরকার নজরুল সবসময় নতুনত্বের পিয়াসী ছিলেন। বাংলা গানকে নানাভাবে নানা দিক থেকে পরীক্ষা করে তিনি আমাদের সুর জগতকে এক নতুন ঐশ্বর্যের অধিকারী করে গেছেন। গান রচনায় তাঁর ক্ষমতা ভগবৎদত্ত। যখন যে অবস্থায় থাকতেন গান রচনা করে দিতেন। আমাদের তখন সব সময় কাজীদার ওখানে আড্ডা ছিল। হৈ চৈ করে আমরা হয়তো ঘরের মধ্যেই রথের মেলা বসিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে দেখি তিনি নির্বিকার চিত্তে লিখে চলেছেন। পরক্ষণেই হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে বলতেন আয় দেখি গানটা সুর করি। আশ্চর্য, গানের কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তখনই দুতিন রকম সুর করে দিতেন। আমরা অবাক হয়ে গেলে বলতেন, গানটা যখন লিখি তখনই মনে মনে তার সুরটা ভেবে নিয়েছি। রাগপ্রধান বাংলা গানে নতুনত্ব প্রথম কাজীদাই আনেন। আগে সাধারণত একটি রাগের ছায়া অবলম্বন করেই রাগপ্রধান বাংলা গান গাওয়া হতো। কিন্তু সমপর্যায়ের দুতিনটি রাগ মিলিয়ে রাগপ্রধান গান তিনিই প্রচলন করেন প্রথম। শুধু তাই নয় নীলাম্বরী, কাবেরী, অরুণরঞ্জনী প্রভৃতি বহু রাগের তিনি সৃষ্টি করেছেন। ঝুমুর গানের প্রচলন তিনিই করেন। আসানসোলের মহুদা কয়লাখনিতে বেড়াতে গিয়ে আমি একবার কতগুলি সাঁওতালী গানের সুর তুলে এনেছিলাম। কিন্তু অপ্রচলিত বলে গ্রামোফোন কোম্পানি তখন এ গানগুলি রেকর্ড করতে রাজী হননি। কাজীদা আমাকে সন্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করিসনে। এ গান তোকে দিয়েই করাব। আর হিটও হবে। তারপর তিনি সাঁওতাল অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের নাচ গান দেখলেন, আর সেই গানের সুরে, নাচের তালে গান রচনা করলেন। পরে গ্রামোফোন কোম্পানি ঐ গান রেকর্ড করে এবং খুবই জনপ্রিয় হয়। এই গানগুলির মধ্যে ছিল 'চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনিঝিনি বাজে লো' 'রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে, বাজে বাঁশের বাঁশি' এবং আমার রেকর্ড 'কালো জল ঢালিতে সই চিকন কালারে পড়ে মনে' ইত্যাদি। মেদিনীপুরের আশেপাশে গ্রামগুলিতে এবং সাঁওতালদের মুখে এ গান এখনো শোনা যায়। নজরুলের গান গ্রামাঞ্চলের জনজীবনে গিয়ে পৌঁচেছে। রেডইণ্ডিয়ান, আফ্রিকান, আরবীয়, জাপানি এবং হাওয়াই প্রভৃতি দীপপুঞ্জের সুরে তিনি যেসব গান রচনা করেছেন সেসব গান অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছে।

তালের ওপর কাজী নজরুলের অসাধারণ দখল ছিল। একবারের ঘটনার কথা বলি। এক গানের আসরে কাজী নজরুল উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে ছিলাম আমি, কলকাতা বেতারকেন্দ্রের তৎকালীন সহকারী পরিচালক সুনীলবাবু ও ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র। ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র গান ধরেছেন, তবলাবাদক একটু নাসিকাকুঞ্চন করে বলে ফেললেন, বাংলা গানের সঙ্গে আবার কি বাজাবেন। কথাটা শুনে নজরুল তখনই ত্রিতালের ওপর একখানি বাংলা গান বাঁধলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শেখালেন। গানটি 'শ্রান্ত বাঁশরী সকরুণ সুরে কাঁদে যবে'। ত্রিতালে বাঁধলে কি হবে, গানটির ছন্দের ঝোঁক কেবল একতালেতে আসে। এরপর আমি যখন সেই গানটি ধরলাম তখন তো আর তবলাবাদক বাজাতে পারে না। ভয়ানক জব্দ। কেবল একতালের ছন্দ আসে। কাজীদার এ রকম অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

..... সংগীত সাধক নজরুলের সহচর্যে এসে মানুষ নজরুলের যে পরিচয় পেয়েছি তার কোন তুলনা হয় না। এমন দিলখোলা আমুদে মানুষ আর দ্বিতীয় দেখিনি। কোন দিন তাঁকে গম্ভীর দেখিনি, চিন্তাভাবনা থাকলেও তা প্রকাশ করতেন না। সবসময় হাসতেন। প্রাণখোলা হাসিতে ঘর কেঁপে উঠতো। তাঁর সূক্ষ্ম কৌতুকপ্রিয়তা সকলকে মাতিয়ে রাখতো।সেই কৌতুকের কথা মনে হলে আজও হাসি পায়। একই কথাকে দুরকম অর্থে ব্যবহার করে তিনি অনেক সময় আমাদের অপদস্থ করতেন। টাকা পয়সার দিকে তাঁর কোন খেয়াল ছিল না। যতক্ষণ হাতে টাকা থাকতো অকাতরে খরচ করতেন। তিনি চরম বিলাসীও ছিলেন। তখনকার দিনে ক্রাইজলার মোটর কিনে তাতে চেপে বেড়িয়েছেন। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদে পারিপাট্য ছিল। সাধারণত মুগা তসর পরতেন। খেলাধুলা ভালবাসতেন। তাসে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। দাবাও ভাল খেলতেন। জীবনকে তিনি পূর্ণভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই চরম ভোগীর মধ্যে আর একটা মানুষ ছিল নির্লিপ্ত, উদাসীন, যোগী।" (নজরুলগীতি অন্বেষা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭ -৯২)

অখিল নিয়োগী ঃ

অখিল নিয়োগী ছিলেন নজরুলের স্নেহধন্য শিষ্য। নজরুল সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ "কাজীদা যখন গান রচনা করতেন কে যেন ভিতর থেকে ঠেলা দিয়ে সুরগুলি আগ্নেয়গিরির লাভার মতো প্রচণ্ড আবেগে ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে দিতো। তখন এই আপনভোলা মানুষটি নাওয়া-খাওয়া একেবারে ভুলে যেতেন। গান লেখা আর সুর দেওয়া ছাড়া তখন কবি নজরুলের অন্য কিছু করবার যো ছিল না। অনেক সময় রসিকতা করে বলতেন, আমায় যে ভুতে খাটিয়ে নেয়। চীৎপুরে একসময় গ্রামোফোনের রিহার্সাল রুম ছিলো। সেখানে একই আসনে বসে নতুন সংগীত রচনা, সেই সংগীতে সুর সংযোজনা, আবার সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতীয় শিল্পীদের সেই সংগীত শিখিয়ে দেওয়া, সারাদিন ধরে চলতে থাকতো। আত্মভোলা কবি নিজের নাওয়া-খাওয়ার কথা বেমালুম

ভুলে থাকতেন। শুধু চা আর পান চলতো সারাদিন ধরে। দিন শেষে বাড়ীতে গিয়ে শুধু একবার অন্ন গ্রহণ।

আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতাম, কাজীদা এইভাবে দিনের পর দিন খাওয়া বর্জন করে চললে কি করে শরীর টিকবে? কাজীদা শুধু আপন মনে হাসতেন, আর হারমোনিয়মের রীড টিপে রাশি রাশি সুর, গানের কলি বের করতেন। প্রথমে গুন গুন করে একটা সুর জাগতো মনে। ঠিক ভ্রমরগুঞ্জনের মতো। তারপর অকস্মাৎ যেন জোয়ার জাগতো ছন্দে-- আর মিলে। দেখতে দেখতে খাতার উপর একটা নিটোল কবিতা রূপলাভ করতো। কিন্তু সেটা কবিতা নয়। আস্ত একটি গান। সুরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো সেই গান। কোন শিল্পীর কণ্ঠে রূপ লাভ করবে সেই গান? কাজীদা যেন আপন মনেই সেই গানকে শুধোতেন, 'কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান, কোথায় রে তোর স্থান?' তারপর আমরা বিস্ময়ে লক্ষ করতাম কোনো গান ইন্দুবালার কণ্ঠে, কোনো গান মৃণালান্তি ঘোষের কণ্ঠে অপরূপভাবে রূপ লাভ করছে। কাজীদার পরশ পেয়ে যেন গানের কারখানা গড়ে উঠতো গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুম।" অখিল নিয়োগী, গানের রাজা কাজীদা, নজরুল কথা, প্রাগুক্ত, পৃষ্টা ২৯১-২৯২)

নজরুলের স্নেহধন্য ইন্দুবালা অন্যত্রে স্মৃতিচারণে উলেখ করেছেন ঃ কাজীদা যখন যেটি করতেন সেইটি নিয়েই মেতে উঠতেন। তখন প্রবোধ গুহ আর অনাদি বসুর প্রতিষ্ঠান মনোমোহন থিয়েটারে নাটক নিয়ে মেতেছেন তিনি। আমিও সে সময় মনোমোহন থিয়েটারে যেগা দিয়েছি। কাজীদা ওঁদের জাহাঙ্গীর নাটকে গান লিখেছেন, আমি গেয়েছি। তারপর ঠিক হলো শচীনবাবুর (নাট্যকার শচীন্দ্রানাথ সেনগুপ্ত) 'রক্তকমল' বই হবে। কাজীদা আমাকে 'খুবই ভালবাসতেন। তাই মনোমোহন থিয়েটারের অনাদি বসুকে বললেন, 'এই নাটকেও ইন্দুকে চাই।' ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিভাবে?' কাজীদা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, এক একটি অঙ্ক শুরু হবার আগে ইন্দু গান গেয়ে পূর্বাভাষ দিয়ে যাবে।' 'বেশ তবে গান লিখে সুর করে দিন।'

নাটকটির ছিল চারটি অঙ্ক। চার অঙ্কের জন্য কাজীদা রচনা করে দিলেন চারখানি গান। সুরও তৈরী করে দিলেন। সেই চারখানি গান হলোঃ

১। ফাগুন রাতে ফুলের নেশায় আগুন জ্বালায় জ্বলিতে আসে;
২। কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি;
৩। ভাঙা মন জোড়া নাহি যায়, ঝরা ফুল আর ফেরে না শাখায়;
৪। ঘোর তিমিরে রবি-শশী-গ্রহ-তারা।

এই চারখানি গান আমি রক্ত কমল নাটকে গাইতাম। কাজীদা অঙ্ক বুঝে সুর তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি অঙ্কের শুরুতে ঐ গানগুলি গাইতাম। তা স্টেজে উঠে গান শেষ করার পর এমন ক্লাপ পড়তো যে এক একটি গান এক নাগাড়ে পাঁচ ছ'বার করে গাইতে হতো। তখনকার দিনে এটাই ছিল যাত্রা-থিয়েটারের রেওয়াজ। হাতালি পড়ার মনে ঐ

গান আবার গাইবার অনুরোধ। এমনি ছিল কাজীদার গান আর সুরের সৃষ্টি। এই চারখানি গান আমি পরে রেকর্ড করেছিলাম।

এটা ১৯৩৬ সালের ঘটনা। ঐ সময়ে আমি মনোমোহনে ছিলাম। তারপর থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় আমি ছেড়ে দিই। কাজীদা এজন্যে খুব ক্ষুনড়ব হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মন্মথবাবুর (নাট্যকার মন্মথ রায়) কারাগার নাটকের ছ'খানা গান আমিই গাইবো। আর তাঁর লেখা আলেয়া নাটকের গানও নিহারবালা ও আমাকে দিয়ে গাওয়াবার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট।

এই 'আলেয়া' নাটক নিয়েও একটা ভারী মজার ঘটনা হয়েছিল। মনোমোহনের মালিকরা কাজীদাকে দিয়ে একটা নতুন নাটক আর গান লেখাবার মতলব করছিলেন, কাজীদা রাজীও হয়েছিলেন লিখতে। কিন্তু আজ লিখি কাল লিখি করে লেখা আর তাঁর হয়ে উঠছিল না। ওদিকে অনাদিবাবুরা রোজই তাগাদা দিয়ে চলছেন। শেষে অনাদিবাবু একদিন ঠাট্টা করে বললেন, 'আরে, এ কাজী না পাজী? ছ'সাত দিনের মধ্যে একশ টাকার পান জর্দা খেয়ে ফেললো, তবু একপাতা নাটক লেখার নাম নেই। দাঁড়াও কাজী তোমায় দেখাচ্ছি মজা। এই বলে তিনি একতাড়া কাগজ আর কলম একটি ঘরে দিয়ে কাজীদাকে দিলেন বন্ধ করে। জানালা দিয়ে পানজর্দা আর খাবার সরবরাহ করা হলো। এইভাবে তৈরী হয়েছিল কাজীদার 'আলোয়া' নাটক আর তার গানগুলি।" (ইন্দুবালা দেবী, আনন্দময় কাজীদান,"নজরুল কথা", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৫)

এখানে নজরুলের নাট্য জগতে প্রবেশ এবং তাঁ অসাধারণ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অখিল নিযোগী বলেন ঃ "নাট্যশালায় নজরুলের প্রবেশ কি করে ঘটলো সেও এক বিচিত্র কাহিনী। মনোমোহন থিয়েটার শ্রীপ্রবোধ গুহ মশাই-এর ব্যবস্থাপনায় নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক অভিনীত হবে। কংসের চরিত্রটির রূপদান করা হয়েছে যেন অত্যাচারী বৃটিশরাজ। এই ভুমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী। নীহারবালা একাই দুটি ভুমিকায় রূপদান করছেন-চন্দনা আর ধরিতী। নিপীড়িতা ধরিত্রীর গান কে রচনা করবেন এই নিয়ে এক মহাসমস্যা দাঁড়ালো। করো নামই থিয়েটার কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় না। সবশেষে নাট্যকার মন্মথ রায় চিঠি লিখলেন কাজী নজরুল ইসলামকে। আত্মভোলা কাজীদা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'আপনার নাটকে গান না লিখলে আমার ক্ষোভের কারণ হবে।'

সুযোগ পেয়ে প্রবোধচন্দ্র একদিন কাজীদাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন মনোমোহন থিয়েটার। তারপর তাঁকে কৌশলে একটি কামরায় বন্দী করে ফেললেন। শিবাজীর মতো মোগল দরবারে কাজীদা বন্দী। বাইরে বেরুবার উপায় নেই। কামরার বাইরে থেকে জানানো হলো খাদ্য, পানীয়, চা পান সব জানালার ভিতর দিয়ে যথাসময়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু কারাগার নাটকের গান শেষ না হলে এই মনোমোহনের কারাগার থেকে মুক্তি নেই। কাজীদা সেই বন্দী অবস্থায় ঝর্ণাধারার মতো গানের বন্যা বইয়ে দিলেন।

আমরা বাইরে থেকে বিস্ময়ে গান শুনি, আর অবাক হয়ে ভাবি, এযে নতুন করে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ। এই ভাবে গান রচিত হল -

'বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা'
'কারার পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ'
'তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত এই'
'নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী
অশ্রুতে অশ্রুতে শঙ্খধ্বনি'

এক একটা গানের সুর হয় আর নীহারবালা নিজকণ্ঠে তাকে ধরে রাখেন।" অখিল নিয়োগী, 'গানের রাজা কাজীদা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ ২৯৩)

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঃ

নজরুল প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন ঃ "এর মধ্যে হঠাৎ শচীন দা (নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত) একদিন বললেন যে মনোমোহন থিয়েটার তাঁর রক্তকমল বই অভিনীত হচ্ছে, তাতে কাজী কতকগুলি অপূর্ব গান লিখে দিয়েছে ও নিজেই সুর দিয়েছে, সেটা যেন শুনে আসি। প্রবোধ গুহ মহাশয় তখন আর্ট থিয়েটার (স্টার) ও মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ দুটোই দেখাশোনা করছেন। তিনিই কাজীকে তিনচার দিন থিয়েটারে রেখে গানগুলি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। 'রক্তকমল' নাটকটি দেখতে গিয়ে যেমন নতুনত্বের আস্বাদ পেলাম তেমনি নতুনত্ব পেলাম রক্তকমলের গানের কথায় ও সুরে। শ্রীমতী ইন্দুবালা ও শ্রীমতি আঙুরবালার কণ্ঠে যে - গান সেদিন শুনেছিলাম তা আজও ভুলতে পারিনি। গানগুলি ছিল 'রক্তকমলের' সম্পদ। অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, বা মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নামো প্রভৃতি গানের কথা ও সুরের অভিনবত্ব থিয়েটারি গতানুগতিক সুর থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। অতি অল্প সময়ে মধ্যে প্রায় ছ'সাতটি গান রচনা করে, সুর দিয়ে স্বয়ং কাজী সকলকে চমকিত করে দিয়েছিলেন।" (বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে, "নজরুল কথা" প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬)

সরযূ দেবী ঃ

বিখ্যাত অভিনেত্রী সরযূ দেবী নজরুল সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণে বলেনঃ "সে সময়, আমাদের সেই ছোটবেলায় তাঁর আরো কতো ভিন্ন স্বাদের গান, বিশেষ করে, 'এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আনলে বলো কে' 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে, 'রুমুঝুমু রুমুঝুমু' - এই ধরনের গানগুলি নিজের মনে গুনগুন করে গায়নি এমন মানুষ কেউ ছিল না বললেই হয়। আমিও আরো অনেকের মতো, সেসময় থেকেই কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানগুলি গাইতাম। গাইবার চেষ্টা অন্তত করতাম বললে ভুল হবে না।

তারপর আমার অভিনেত্রী জীবনে কাজী নজরুল ইসলামের কাছাকাছি আসবার সুযোগ এসে গেল হঠাৎ। তখন আমি প্রবোধ গুহ আর অনাদি বসুর প্রতিষ্ঠান মনোমোহন থিয়েটারে কাজ করছি। ঠিক হলো, মনোমোহন থিয়েটারে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা 'রক্তকমল' নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। আর সে নাটকে আমি মমতার ভূমিকায় অভিনয় করবো।

এ পর্যন্ত সবই ভালো। আমায় ভয় পাবার মতো বা ভাবনায় পড়বার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু তারপরে যা শুনলাম অনাদিবাবুর মুখে তাতেই আমাকে থমকে উঠতে হলো। শুনলাম, 'রক্তকমলের' মমতার ভূমিকায় আমাকে পাঁচটি গান গাইতে হবে। গান গাইতেও আমি পেছপাও হলাম না, কিন্তু যখন শুনলাম গানগুলি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা আর তিনি নিজেই সুর তৈরি করে আমাকে শিখিয়ে দেবেন, তখন আমাকে পিছিয়ে আসতে হলো।

কাজী নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে সামনে বসে গান শিখতে হবে শুনে তো আমি ভয়ে লজ্জায় কেঁদে মরি আর কি। প্রবোধ বাবু স্পষ্ট গলায় বললেন, 'রক্ত কমলের জন্য গান লিখবেন কাজী সাহেব, তিনিই সুর দেবেন গানে। আর সরযু, কাজী সাহেবের কাছ থেকেই গান ক'খান তুলে নিতে হবে তোমাকে। শুনে আমার তো মুখ চুণ। ভয়ে ভয়ে বললাম 'আমি গানের কি বা জানি যে, এতবড় একজন মানুষের কাছে গান শিখতে যাবো? গান গাইবার জন্যে আমি কিছু ভাবছি না কিন্তু কাজী সাহেবের কাছে না গিয়ে গানগুলো অন্য উপায়ে তোলা যায় না কি?' অনাদি বাবু বিচক্ষণ মানুষ। আমার মনের ভাব বুঝতে তাঁর মোটেই দেরী হলো না। বললেন, 'তোমার কিছু ভয় নেই সরযূ, যা ভাবছো তা নয়, কবির কাছে গিয়েই দেখো না -' প্রবোধ বাবুও অভয় দিয়ে বললেন, 'কাজী সাহেবের এতো নাম হলে কি হবে, মানুষ কিন্তু সহজ নিরহঙ্কারী। তোমার কোন ভয় পাবার কারণ নেই। দেখবে এক মিনিটের মধ্যেই আপনজন হয়ে উঠবেন তোমার।'

তা দেখলাম ওঁরা মিথ্যে বলেননি। এক মিনিটে না হলেও এক ঘন্টার মধ্যেই তার প্রমাণ পেয়ে গেলাম। থিয়েটারের একটি ঘরে কাজী নজরুল তাঁর দু'চারজন সঙ্গী নিয়ে বসেছিলেন। সামনে হারমোনিয়াম। পাশে পানের একটি বড় ডিবে, জর্দার কৌটো। দরজার সামনে গিয়ে আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেই ভেতর থেকে তিনি সস্নেহে হেসে ডাকলেন। 'এসো এসো সরযূ, থামলে কেন? আমিও যেন স্তব্ধ মূক হয়ে মন্ত্র মুগ্ধের মতো কবির কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লাম ধপ করে।

দূর থেকে কবিতা আর গান শুনে যাঁকে বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি, গম্ভীর ভারিক্কী বিরাট এক মানুষ ভেবে রেখেছিলাম, কাছে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁর সহজ সরল সুন্দর অন্ত রঙ্গ ব্যবহারে। সেদিন মনে মনে অনুভব করলাম খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠেও মানুষ নিজের নাম আর খ্যাতির বেড়া ভেঙে অপরিচিত জনকে এমন আপন করে হৃদয়ের অন্ত ঃপুরে স্থান করে দিতে পারেন, তিনি কী অসাধারণ!

সেদিন দেখা হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই কখন যে এই দেশজোড়া বিখ্যাত মানুষটি আমার কাজীদা হয়ে উঠলেন, তা জানতেও পারলাম না। গেলাম 'রক্তকমলের' মমতার গান শিখতে। কিন্তু গানের কথা কই? এযে দেখি গল্পের আসর। নানা রকম মজার মজার গল্পে আর প্রাণখোলা হাসিতে কাজীদার ওই বড় ঘরটি ভরিয়ে তুললেন যেন। আমিও তাঁর কোলের কাছটিতে বসে কখন যে সেই সব হাসি আর মজার গল্প শুনতে লেগে গেছি ও তাঁর হাসির সুরে সুর মিলিয়ে হাসতে শুরু করে দিয়েছি সে খেয়াল নেই তখন। .....

সেদিন কাজীদা তাঁর মজলিশী গল্প কথার ফাঁকে এক সময়ে 'রক্তকমল' নাটকের একখানি গান গুন গুন করে ক'বার গেয়েই আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'একবার আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও তো সরযূ।' আমি ভুলে গেলাম, কাজীদার কাছে গান শিখতে এসেছি। নিতান্তই কথার ছলে তিনি গুন গুন করে গান গাইলেন, আর বললেন আমাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাইতে, তাই আমিও সব তুলে খুব সহজভাবেই শুরু করে দিলাম। তখন যদি ঘুণাক্ষরেও আমার মনে পড়তো যে, কাজীদার কাছে 'রক্তকমলের' এই গানগুলিই আমি শিখতে এসেছি, তাহলে কি হতো, একবার বললেই আমি অমন করে গাইতে শুরু করতাম কিনা, তা আজ আর বলতে পারবো না।

কাজীদার কথা শুনে আমি গানটি গেয়ে উঠতেই উনি উৎসাহ দিয়ে হেসে বললেন, 'বাঃ, বহুত আচ্ছা। তুমি তো বেশ চমৎকার গাও, তবে এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিলে কেন?' আমি কোন জবাব দিলাম না। সলজ্জভাবে হেসে মুখ নিচু করে চুপটি করে বসে রইলাম।

এরপর তিনি আমাকে শিখিয়ে দিলেন কেমন করে মমতার গানগুলি গাইতে হবে। সেদিন ওই ঘরে বসেই আমার ভূমিকার জন্য পাঁচখানি গান লিখে সুর তৈরী করে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কাজীদার সেই সব গান আমি স্টেজে উঠে গাইলাম খুব সাফল্যের সঙ্গে। সকলেই একবাক্যে বললেন সুন্দর গান, চমৎকার সুর। আর আমি নাকি গেয়েছিও ভাল। মনে আছে সেই আমার কাজীদার কাছে প্রথম গান শেখা।'

স্মৃতিচারণে সরযূ দেবী আরও বলেনঃ "১৯৩০ সালে নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত 'মহুয়া' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করার ডাক এলো আমার কাছে। মহুয়া নাটকে গান লিখেছিলেন কাজীদা। আমার জন্যে যে গান সাতখানি লিখলেন তার সুর তৈরী করলেন, তা খুব সাধারণ সাদামাটা গান নয়। দেখলাম দেব দুরূহ রাগপ্রধান গান সেগুলি। নাটকের এই গানগুলি স্টেজে উঠে আমাকে গাইতে হবে শুনে আমি বেঁকে বসলাম একেবারে। বললাম, 'ও আমি কিছুতেই পারবো না' থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন? বললাম, 'কেন কিন এসব রাগপ্রধান কঠিন গান। এসব গান গাইতে হলে তা রীতিমতো তালিম নেওয়ার দরকার - একি আর হুট করলেই গাওয়া যায়?' 'কিন্তু কাজী সাহেবের আগের গানগুলোওতো তুমি গেয়েছিলে

বললাম, 'আগেরগুলো মোটামুটি সাদামাটা সুরের ছিলো, তাই চালিয়ে দিয়েছিলাম কোন রকমে কিন্তু এসব গান খেলার কথা নয়। স্টেজে উঠিয়ে আমাকে লোকের হাসির খোরাক করতে চান না কি?' আমি যখন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এইসব কথা বলছিলাম, কাজীদা যেন পাশেই একটি ঘরে বসেছিলেন। আমার গলার আওয়াজ শুনে উঠে এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি দেখে বললাম, 'হাসছেন কি কাজীদা, সত্যি বলছি ওসব গান আমি গাইতে পারবো না। দর্শকরা গান শুনে গালাগাল দেবে সে আমি সহ্য করতে পারবো না - তা আগে থেকে বলে রাখছি।' কথা বলতে বলতে রাগ দেখাবার জন্যে মুখটা আমি বেশ ব্যাজার ব্যাজার করলাম। কাজীদা আমার কথা শুনে আর মুখে চেহারা দেখে আবার হা হা করে হেসে সারা ঘর ভরিয়ে তুললেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেনঃ 'বাঃ বাঃ সরযূ দেবী দেখছি সত্যিই বেশ বড় অভিনেত্রী হয়ে উঠেছেন, কেমন দিব্যি গুছিয়ে গাছিয়ে বড় বড় কথা বলছে দ্যাখো।' বললাম, বড় বড় কথা নয় কাজীদা, সত্যি কথাই বলছি। আচ্ছা, আপনি নিজেই একটু ভেবে বলুন ঠিক বলছি কিনা?' কাজীদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দুচোখে হাসির আলো জ্বালিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তাইতো দেখছি। আমরা কথা নিয়ে বেসাতি করি, আমাদের মাথাতেও এত কথা আসে না। বলে আবার তিনি খুব মজা করে হাসতে লাগলেন। কাজীদার এইসব সহজ সরল ঠাট্টার কথা আর প্রাণখোলা হাসিতে আমার সমস্ত আপত্তি ভেসে গেল যেন। আমি যতো প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বলি 'না এ আমার দ্বারা হবেনা।' উনি তাতোই জেদ ধরে বলে 'হ্যা, হবে, হতেই হবে। না হলে আমার নাম বদলে দিও তুমি।' তারপর আমাকে পাশে বসিয়ে হাসতে হাসতে বললেনঃ 'তোমাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না, সরযূ, লাফাতে হবে না, ডিগবাজী খেতে হবে না, এক পায়ে দাঁড়াতে হবে না, কোনো কিছুই করতে হবে না। শুধু করতে হবে কি? - না আমার সঙ্গে সঙ্গে গাইবে আর হাসবে, আনন্দ করবে।' তারপর একটু থেমে যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেল, এমনি ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ওঃ হো, তুমি তো আবার জর্দা খেতে ভালবাসো, আচ্ছা দ্যাখো, তোমায় কি সুন্দর জর্দা খাওয়াচ্ছি।' বলে তিনি নিজ হতে বাটা থেকে পান নিয়ে সেজে তাতে জর্দা দিয়ে আমার মুখে পুরে দিলেন। যেন ছোট মেয়েকে আদর করে স্নেহ দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে প্রথম ভাগ পড়াচ্ছেন - এমনি তার ভাবখানা। .... কাজীদা নানভাবে উৎসাহ দিয়ে মাত্র তিন কি চার দিনের মধ্যে ওই অতোগুলো দুরূহ রাগ প্রধান গান একেবারে পাখী পড়ানোর মতো করে আমাকে শিখিয়ে দিলেন। আমার কণ্ঠে কাজীদার সেসব অপূর্ব সুরসমৃদ্ধ গান শুনে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ শুধু নয়, কাজীদা নিজেও খুব খুশি হয়ে উঠলেন। সস্নেহে পিঠে চড় মেরে বললেন 'কিরে বলছিলি যে হবে না, এসব কঠিন রাগপ্রধান গান গাইতে পারবি না মোটেই। এবার কি হলো?' বললাম, 'আপনার শেখানোর গুণে কাজীদা আমার কিছু কৃতিত্ব নেই।' কাজীদা 'হা হা করে হেসে বললেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেতো বটেই, খুব চালাক হয়েছিস দেখছি।'

কাজীদার লেখা আর সুর দেওয়া সেইসব গান গেয়ে বাংলাদেশর লক্ষ লক্ষ বিদগ্ধ সুধী দর্শকের প্রশংসা আর আশীবাদ অর্জন করেছি আমি। কতোদিন ধরে মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে কাজীদার কতো গান যে কতোবার গেয়েছি তার সঠিক হিসেব আজ আর দিতে পারবো না। আর কাজীদার লেখা কাজীদার সুরের গান শুধু মঞ্চের নাটকে অভিনয় করার কালেই গাইনি আমি, বহু রেকর্ডের পালা নাটকেও গেয়েছি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পালা নাটক বিদ্যাপতি, সিরাজউদ্দৌলার কথা। স্বর্গীয় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর মঞ্চনাটকেও কাজীদার লেখা গান তাঁর নিজের দেওয়া সুরে আমি গেয়েছি।

কতোবার দেখেছি মঞ্চনাটক কিংবা রেকর্ডের পালা নাটকে আমার ভূমিকার জন্যে কাজীদা আলাদা করে বিশেষভাবে গান লিখে সুর তৈরী করে দিয়েছেন। আর সেইসব গান গেয়ে আমি অধিকতর সুনাম অর্জন করেছি। এর সব কারণের জন্যে ওই একটি মানুষ--কাজীদার কাছে যে আমিই কতো ঋণী, তা বলে আজ আর বোঝাতে পারবো না। কাজীদা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন স্নেহপ্রবণ অগ্রজের মতো। দিনের পর দিন দুর্লভ স্নেহচ্ছায়ায় রেখে সুরের রাজা কাজীদা আমাকে সুরের রাজ্যের সীমানার নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমার মনে এই আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছেন যে, আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব না। একজনের মনে এই সব পারার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা বড়ো সাধারণ কথা যে নয়, তা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করেছি বহুবার। (সরযূ দেবী, 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি,' নজরুল কথা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৬)

আব্বাস উদ্দিন ও ইসলামী সংগীত ঃ

নজরুল সংগীতের ভিতর দিয়েই তিনি বাংলার মুসলিম জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশপথ পেয়েছেন। নজরুলের ইসলামী গান রচনার ব্যাপারে আব্বাসউদ্দিনের অবদান আছে। তিনি এ ব্যাপারে নজরুলকে উদ্যোগী করে তোলেন। তাঁর 'অমার শিল্পী জীবনের কথা' গ্রন্থে ঃ আব্বাস উদ্দিন বলেনঃ ''কাজীদার লেখা গান ইতিমধ্যে অনেকগুলো রেকর্ড করে ফেললাম। তাঁর লেখা 'বেণু কার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর' 'অনেক ছিল বলার যদি দুদিন আগে অসতে', 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কৈ', 'বন্ধু আজো মনে রে পরে আম কুড়ানো খেলা' ইত্যাদি রেকর্ড করলাম।

একদিন কাজীদাকে বললাম, কাজীদা একটা কথা মনে হয়, এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায়, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রী হয়, এই ধরনের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? তারপর আপনি তো জানেন কিভাবে কাফের কুফর ইত্যাদি বলে বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাংক্তেয় করে রাখবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মান্ধ। আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।''

কথাটা তাঁর মনে লাগল? তিনি বলেন, 'আব্বাস, তুমি ভগবতী বাবুকে বলে ত্রার মত নাও, আমি ঠিক বলতে পারব না।' আমি ভগবতী ভট্টাচার্য অর্থাৎ গ্রামোফোন

কোম্পানির রিহার্সেল -ইন-চার্জকে বললাম। তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'না না না ওসব গান চলবে না। ও হতে পারে না।'

মনের দুঃখ মনেই চেপে গেলাম। এর প্রায় ছমাস পরে। একদিন দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি অফিস থেকে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল ঘরে গিয়েছিল। দেখি একটিা ঘরে বৃদ্ধা আশ্চার্যময়ী আর বৃদ্ধ ভগবতী বাবু বেশ রসাল গল্প করছেন। আমি নমস্কার দিতেই বৃদ্ধ বললেন, 'বসুন বসুন'। আমি বৃদ্ধের রসাপ্লুত মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম, এই -ই উত্তম সুযোগ। বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বলি। সেই যে বলেছিলাম ইসলামী গান দেবার কথা, আচ্ছা, একটা এক্সপেরিমেন্টই করুন না, যদি বিক্রী না হয়, আর নেবেন না, ক্ষতি কি?' তিনি হেসে বললেন, 'নেহাতই নাছোরবান্দা আপনি, আচ্ছা আচ্ছা করা যাবে।'

শুনলাম পাশের ঘরে কাজীদা আছেন। আমি কাজীদাকে বললাম যে ভগবতীবাবু রাজী হয়েছেন। তখন সেখানে ইন্দুবালা কাজীদার কাছে গান শিখছিলেন। কাজীদা বলে উঠলেন, 'ইন্দু তুমি বাড়ী যাও, আব্বাসের সাথে কাজ আছে।' ইন্দুবালা চলে গেলেন। এক ঠোংগা পান আর চা আনতে বললাম দশরথকে। তারপর দরজা বন্ধ করে আধঘন্টার ভিতরই লিখে ফেললেন,'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'। তখুনি সুরসংযোগ করে শিখিয়ে দিলেন। পরের দিন ঠিক এসময়ে আসতে বললেন। পরের দিন লিখলেন, 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর'।

গান দুখানা লেখার ঠিক চারদিন পরেই রেকর্ড করা হল। কাজীদার আর ধৈর্য মানছিল না। তাঁর চোখেমুখে কী আনন্দই যে খেগে যাচ্ছিল। তখনকার দিনে যন্ত্র ব্যবহার হত শুধু হারমোনিয়াম আর তবলা। গান দুখানা আমার তখনও মুখস্ত হয়নি। তিনি নিজে যা লিখে দিয়েছিলেন, মাইকের পাশ দিয়ে হারমোনিয়ামের উপর ঠিক আমার চোখ বরাবর হাত দিয়ে কাজীদা নিজেই সেই কাগজখানা ধরলেন, আমি গেলে চললাম। এই হল আমার প্রথম ইসলামী গানের রেকর্ড। দুমাস পরে ঈদুল ফিতর। শুনলাম গান দুখানা তখন বাজারে বের হবে।

ঈদের বাজার করতে একদিন ধর্মতলার দিকে গিয়েছি। বি.এন. সেন অর্থাৎ সেনোলা রেকর্ড কোম্পানির বিভূতিদার সাথে দেখা। তিনি বললেন, আব্বাস আমার দোকানে এসো।' তিনি এক ফটোগ্রাফার ডেকে নিয়ে এসে বললেন, 'এর ফটোটা নিনতো'। আমি তা অবাক। বললাম, ব্যাপার কি?' তিনি বললেন, 'তোমার একটা ফটো নিচ্ছি, ব্যস আবার কি?

ঈদের বন্ধে বাড়ি গেলাম। বন্ধের আরো কুড়ি পঁচিশ দিন ছুটি নিয়েছিলাম। কলকাতা ফিরে এসে ট্রামে চড়ে অফিস যচ্ছি। ট্রামে একটি যুবক আমার পাশে গুন গুন করে গাইছে, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে'। আমি একটু অবাক হলাম। এ গান কি করে শুনল? অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছি, মাঠে বসে একদল

ছেলের মাঝে একটি ছেলে গেয়ে উঠল, ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে। তখন মনে হল ও গান তো ঈদের সময় বাজারে বের হবার কথা। বিভূতিদার দোকানে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি একদম জড়িয়ে ধরলে। সন্দেশ, রসগোল্লা, চা এনে বললেন, 'খাও'। আমার গান দুটো এবং আর্ট পেপারে ছাপানো আমার বিরাট ছবির একটা বাণ্ডিল সামনে রেখে বলেন, 'বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিলি করে দিও। আমি প্রায় সত্তর আশি হাজার ছাপিয়েছি, ঈদের দিনে এসব বিতরণ করেছি। আর এই দেখ দুহাজার রেকর্ড এনেছি তোমার।

আনন্দে খুশিতে মন ভরে উঠল। ছুটলাম কাজীদার বাড়ী। শুনলাম তিনি রিহার্সেল রুমে গেছেন। গেলাম সেখানে। দেখি দাবা খেলায় তিনি মত্ত। দাবা খেলতে বসলে দুনিয়া ভুলে যান তিনি। আমার গলার স্বর শুনে একদম লাফিয়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'আব্বাস তোমার গান কী যে,'----- আর বলতে দিলাম না, পা ছুঁয়ে তার কদমবুসি করলাম। ভগবতীবাবুকে বললাম, 'তহলে এক্সপেরিমেনটের ধোপে ঠিকে গেছি, কেমন? তিনি বললেন, 'এবার তাহলে আরো কখানা এই ধরনের গান.....' খোদাকে দিলাম কোটি ধন্যবাদ।

এরপর কাজীদা লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লা রসুলের গান পেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে জাগালো এক নব উন্মাদনা। যারা গান শুনলে কানে আঙ্গুল দিত তাদের কানে গেল, 'আল্লা নামের বীজ বুনেছি' 'নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল'। কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল ও গান, আরো শুনল, 'আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়'। মোহররমে শুনল মার্সিয়া, শুনল, 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহম্মদ এলরে দুনিয়ায়'। ঈদে নতুন করে শুনল, 'এলো আমার ঈদ, ফিরে এলো আমার ঈদ, চল ঈদগাহে।' ঘরে ঘরে এল গ্রামোফোন রেকর্ড, গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আল্লাহ রসুলের নাম।

কাজীদাকে বললাম, 'কাজিদা মুসলমান তো একটু মিউজিক মাইণ্ডেড হয়েছে। এবার তরুণ ছাত্রদের জাগাবার জন্য লিখুন।' তিনি লিখে চললেন, 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে,' শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জামায়েত ভারী, 'আজ কোথায় তখতে তাউসে কোথায় সে বাদশাহী।' . . .

প্রায় প্রতি মাসেই আমার রেকর্ড বাজারে বের করা আরম্ভ হল। কিন্তু প্রতিমাসে গান বের হলে একজন আর্টিস্টের গান একঘেঁয়ে হয়ে যায়। অথচ ইসলামী গান গ্রামোফোন কোম্পানি ঘরে এনেছে অর্থের প্লাবন। তাই মুসলমান গায়কের অভাব বলে ধীরেন দান সজলের গনি মিঞা, চিত্তরায় সাজলের দোলোয়ার হোসেন, আশ্চর্যময়ী, হরিমতী এঁরা কেউ সাজলের সকিনা বেগম, আমিনা বেগম, গিরিন চক্রবর্তী সজলেন সোনা মিঞা।

যাই হোক আমার মানে কিন্তু দিন রাত খেলে যাচ্ছে এক অপূর্ব আনন্দোন্মাদনা। এই তো চাই। মুসলমানের ঘুম ভেঙেছে।" (আব্বাসউদ্দীন আহমদ, আমার শিল্পীজীবনের কথা, ঢাকাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃষ্ঠ ৫৭-৬১)